MD Hasibul Hassan Shanto
Patuakhali Medical College

অধ্যায় ২

প্রাণীর পরিচিতি
Animal's Identity

প্রধান শব্দাবলি (Key wor

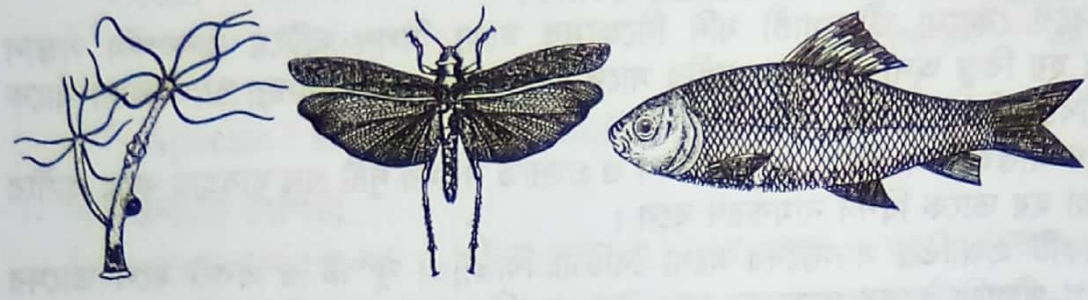

▫ দ্বিস্তরী প্রাণী	▫ সিলেন্টের
▫ মেসোগ্লিয়া	▫ নেমাটো
▫ মুকুলোদগম	▫ মিথোজীবি
▫ অ্যান্টেনা	▫ পুঞ্জাক্ষি
▫ ওমাটিডিয়া	▫ র‍্যাবডোম
▫ ওভিপজিটর	▫ ওভারিওল
▫ ডায়াপজ	▫ রূপান্তর
▫ স্ট্রীমলাইন্ড	▫ বৃদ্ধিরেখা
▫ ভেনাস হার্ট	▫ ফুলকা
▫ বায়ুথলি	▫ রেণুপোন
▫ মৎস খনি	▫ মৎস অভ

বৈচিত্র্যময় এ পৃথিবীতে নানা ধরনের প্রাণীর বাস। বৈচিত্র্য রয়েছে এদের বসতি, গঠন, চলন, খাদ্যগ্রহণ, আচার-ব্যবহার, প্রজনন ইত্যাদিতে। এসব প্রাণীর মধ্যে কোনটা সরল প্রকৃতির কেউ জটিল গঠনের অধিকারী। এ অধ্যায়ে আমরা হাইড্রা, ঘাসফড়িং এবং রুই মাছ সম্বন্ধে আলোচনা করব।

পিরিয়ড সংখ্যা–২৫ : এ অধ্যায় পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা যা পারবে (শিখনফল)

বাংলাদেশে *Hydra*-র নিম্নোক্ত প্রজাতিগুলো পাওয়া যায় বলে জানা গেছে–

Hydra fusca ঃ হাইপোস্টোমের গোড়ার চতুর্দিক ঘিরে ৬টি কর্ষিকা থাকে।

Hydra viridis ঃ হাইপোস্টোমের গোড়ার চতুর্দিক ঘিরে ৪-৮টি কর্ষিকা থাকে।

Hydra vulgaris ঃ হাইপোস্টোমের গোড়ার চতুর্দিক ঘিরে ৬-১০টি কর্ষিকা থাকে।

▫ **Brein** (1955) এর মতে প্রতি 45 দিন অন্তর অন্তর *Hydra*-র দেহের সকল কোষ ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। কোষের এ বৈশিষ্ট্যকে **টটিপোটেন্ট** (totipotent) বলে।

শিখনফল	বিষয়বস্তু
	(Hydra) দেহপ্রাচীরের কোষের বৈশি গ্রহণ ও পরিপাক প্রক্রিয়া ও জনন ○ মিথোজীবিতা
	○ হাইড্রার স্থায়ী স্লাইড/মডেল পর্য
৭. ঘাসফড়িং-এর পরিপাকতন্ত্র ও পরিপাক পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবে।	● ঘাসফড়িং (*Poekilocerus pictus*)
৮. ব্যবহারিক-ঘসিফড়িং/আরশোলার মুখোপাঙ্গ শনাক্ত ও চিত্র অংকন	○ গঠন (বাহ্যিক) পরিপাকতন্ত্র-মুখ উপাঙ্গ, পরিপাক
৯.	হারিক ঘাসফড়িং/আরশোলা-র মুখ উপ
১০.	ঘাসফড়িং/আরশোলা-র পরিপাক ও গ্রন্থি পর্যবেক্ষণ
১১.	
১২.	সফড়িং ○ সংবহন পদ্ধতি ○ শ্বসন পদ্ধতি ○ রেচন পদ্ধতি ○ প্রজনন প্রক্রিয়া ও
১৩. ঘাসফড়িং-এর প্রজনন প্রক্রিয়া ও রূপান্তর পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবে।	
১৪. রুই মাছের গঠন বর্ণনা করতে পারবে।	● ঘাসফড়িং এর পুঞ্জাক্ষী ○ গঠন ○ দর্শন কৌশল
১৫. রুই মাছের রক্ত সংবহনতন্ত্রের বর্ণনা করতে পারবে।	● রুই মাছ (*Labeo*) ○ দেহ গঠন (বাহ্যিক) ○ রক্ত
১৬. ব্যবহারিক- রুই/কাতলা/মৃগেল মাছ ব্যবচ্ছেদ করে রক্ত সংবহনতন্ত্র শনাক্ত এবং চিত্র অংকন করতে পারবে।	● **ব্যবহারিক** ○ রুই/কাতলা/মৃগেল মাছের রক্ত
১৭. রুই মাছের শ্বসন ও বায়ুথলির গঠন বর্ণনা করতে পারবে।	পর্যবেক্ষণ। ○ শ্বসন ও বায়ুথলির
১৮. ব্যবহারিক : রুই/কাতলা মৃগেল মাছের শ্বসনতন্ত্র ব্যবচ্ছেদ করে ফুলকা ও পটকা (বায়ুথলি) শনাক্ত করতে পারবে।	● **ব্যবহারিক** ○ রুই/কাতলা/মৃগেল ফুলকা ও বায়ুথলি পর্যবেক্ষণ

২.১ প্রতীক প্রাণী : *Hydra*

হাইড্রা নিডারিয়া (Cnidaria) পর্বভুক্ত সরল গড়নের জলজ প্রাণী। প্রাণিজগতের দুটি পর্ব **দ্বিভ্রূণস্তরী** বা **ডিপ্লোব্লাস্টিক প্রাণী** (diploblastic animal) নামে পরিচিত। এদের একটি হচ্ছে **নিডারিয়া**, অন্যটি **টিনোফোরা** (Ctenophora)। হাইড্রা Cnidaria পর্বভুক্ত দ্বিভ্রূণস্তরী প্রাণী। ভ্রূণীয় পরিস্ফুটনের সময় দুটি ভ্রূণীয় কোষস্তর (এক্টোডার্ম ও এন্ডোডার্ম) থেকে পরিণত প্রাণীর বিভিন্ন অঙ্গের সৃষ্টি হয়। পরিণত ডিপ্লোব্লাস্টে এক্টোডার্ম থেকে দেহের আবরণ হিসেবে **এপিডার্মিস** (epidermis) এবং এন্ডোডার্ম থেকে দেহের অন্তঃস্থ গ্যাস্ট্রোভাস্কুলার গহ্বরের (সিলেন্টেরনের) আবরণ হিসেবে **গ্যাস্ট্রোডার্মিস** (gastrodermis) সৃষ্টি হয়। **অ্যান্টনি ভ্যান লিউয়েনহুক** (Antony Van Leeuwenhoek) ১৭০২ সালে হাইড্রা আবিষ্কার করেন। **আব্রাহাম ট্রেম্বলে** (Abraham Trembley) ১৭৪৪ সালে হাইড্রার প্রচন্ড পুনরুৎপত্তি ক্ষমতা প্রকাশের মাধ্যমে এর প্রাণিপ্রকৃতিকে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন যার ফলে হাইড্রার ব্যাপক পরিচিতি ঘটে। ১৭৫৮ সালে **ক্যারোলাস লিনিয়াস** (Carolus Linnaeus, 1707-1778) এর নাম দেন *Hydra*। গ্রিক রূপকথার নয় মাথাওয়ালা ড্রাগনের নামানুসারে *Hydra*-র নামকরণ করা হয়। ঐ ড্রাগনটির একটি মাথা কাটলে তার বদলে দুই বা তার বেশি মাথা গজাতো। *Hydra* ঐ ড্রাগনের মতো হারানো বা ক্ষতিগ্রস্ত অংশ পুনরায় সৃষ্টি করতে পারে, তাই অনেক সময় বহু মাথাওয়ালা সদস্য আবির্ভূত হয়। মহাবীর **হারকিউলিস** অবশেষে এ দানবকে বধ করেন।

বাংলাদেশে *Hydra*-র বিভিন্ন প্রজাতি

বর্তমানে পৃথিবীতে *Hydra*-র প্রজাতি-সংখ্যা ৪০টির মতো। গায়ের রং, কর্ষিকার সংখ্যা ও দৈর্ঘ্য এবং জননাঙ্গের অবস্থান ও আকৃতির ভিত্তিতে হাইড্রার শ্রেণিবিন্যাস করা হয়। ২০০৮ সালে প্রকাশিত বাংলাদেশের উদ্ভিদ ও প্রাণী জ্ঞানকোষের চতুর্দশ খণ্ডের (Bangladesh Encyelopedia of Flora and Fauna, vol.14) তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে ৩ প্রজাতির হাইড্রার উল্লেখ পাওয়া যায়: (১) বাদামী বর্ণের *Hydra oligactis (=H. fusca)*, (২) সবুজ বর্ণের *Hydra viridissima (=H. viridis, Chlorohyda viridissima)* এবং (৩) বর্ণহীন বা স্বচ্ছ *Hydra vulgaris*।

বিভিন্ন প্রজাতির *Hydra*-র মধ্যে বাংলাদেশে *Hydra vulgaris* সুলভ বলে এখানে এ প্রজাতির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

বাসস্থান ও স্বভাব : *Hydra* একটি একক **মুক্তজীবী প্রাণী**। মিঠাপানিতে (খাল, বিল, পুকুর, হ্রদ, ঝর্ণা) নিমজ্জিত কঠিন বস্তু এবং জলজ উদ্ভিদের পাতার নিচের তলে সংলগ্ন থেকে নিম্নমুখী হয়ে ঝুলে থাকে। স্থির, শীতল ও পরিষ্কার পানিতে এদের বেশি পাওয়া যায়। ঘোলা, উষ্ণ ও চলমান পানিতে এদের পাওয়া যায় খুব কম। ক্ষুধার্ত অবস্থায় এরা দেহ ও কর্ষিকাকে সর্বোচ্চ প্রসারিত করে পানিতে দুলতে থাকে। কোন কিছুর সংস্পর্শে এরা দেহকে সঙ্কুচিত করে ফেলে। এরা **মাংসাশী** (অর্থাৎ অন্য কোনো প্রাণী খেয়ে জীবন ধারণ করে)। কর্ষিকার সাহায্যে খাদ্য গ্রহণ করে। চলাফেরা করে দেহের সংকোচন-প্রসারণ ও কর্ষিকার সাহায্যে। দেহপ্রাচীরের মাধ্যমে **ব্যাপন** (diffusion) প্রক্রিয়ায় শ্বসন ও রেচন সম্পন্ন করে। মুকুলোদ্গম ও দ্বিবিভাজনের মাধ্যমে অযৌন জনন এবং জননকোষ সৃষ্টি করে যৌন জনন সম্পন্ন হয়। *Hydra*-র **পুনরুৎপত্তি** (regeneration) ক্ষমতা প্রচন্ড।

চিত্র ২.১.১ : জলজ উদ্ভিদের গায়ে সংলগ্ন দুটি *Hydra*

শ্রেণিতাত্ত্বিক অবস্থান (Systematic Position)

Kingdom : Animalia (প্রাণী)
Phylum : Cnidaria (নিডোসাইট ও সিলেন্টেরন উপস্থিত)
Class : Hydrozoa (অবিভক্ত সিলেন্টেরন)
Order : Hydroida (পলিপ দশা প্রধান)
Family : Hydridae (এককভাবে বসবাস করে)
Genus : *Hydra* (পুনরুৎপত্তি ক্ষমতাসম্পন্ন)
Species : *Hydra vulgaris*

Hydra-র বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য

আকার-আকৃতি : *Hydra*-র দেহ নরম ও অনেকটা নলাকার। দেহের একপ্রান্ত খোলা (ওরাল বা মৌখিক প্রান্ত) এবং অপরপ্রান্ত বন্ধ (অ্যাবওরাল বা বিমৌখিক প্রান্ত), অন্য প্রান্তে মুখছিদ্র অবস্থিত, আর বন্ধ প্রান্তটি কোনো বস্তুর সাথে যুক্ত থাকে। দেহ **অরীয় প্রতিসম** (radial symmetry) এবং ১০ থেকে ৩০ মিলিমিটার পর্যন্ত লম্বা ও প্রায় ১ মিলিমিটার চওড়া।

বর্ণ : প্রজাতিভেদে *Hydra*-র বর্ণ বিভিন্ন হয়ে থাকে। *Hydra vulgaris* প্রায় বর্ণহীন (হালকা হলুদ – বাদামী), তবে গৃহীত খাদ্যের প্রকৃতি অনুযায়ী বর্ণ বৈষম্য দেখা যায়।

বহির্গঠন : একটি পরিণত *Hydra*-র দেহকে প্রধানত তিনটি অংশে ভাগ করা যায় : ১. **হাইপোস্টোম**, ২. দে… ৩. **পদতল বা পাদ-চাকতি**। নিচে এসব অংশের বর্ণনা দেয়া হলো।

১. হাইপোস্টোম (Hypostome) **:** এটি দেহের মুক্ত প্রান্তে অবস্থিত, মোচাকৃতি, ছোট ও সংকোচন-প্রসা… অংশ। এর চূড়ায় বৃত্তাকার **মুখছিদ্র** অবস্থিত। মুখছিদ্রপথে খাদ্য গৃহীত ও অপাচ্য অংশ বহিষ্কৃত হয়।

২. দেহকান্ড (Trunk) **:** হাইপোস্টোমের নিচ থেকে পাদ-চাকতির উপর পর্যন্ত সংকোচন-প্রসারণশীল দেহকাণ্ড। এতে নিচে বর্ণিত অংশগুলো পাওয়া যায়।

- **কর্ষিকা** (Tentacle) **:** হাইপোস্টোমের গোড়ার চতুর্দিক ঘিরে ৬-১০টি সরু, সংকোচনশীল দেহ অপে… ও ফাঁপা সুতার মতো কর্ষিকা অবস্থিত। কর্ষিকার বহিঃপ্রাচীরে অসংখ্য ছোট টিউমারের মতো **নেমাটোসিস্ট ব্যাটারী** (nematocyst battery) থাকে। প্রত্যেক ব্যাটারীতে থাকে কয়েকটি করে বিভিন্ন ধরনের নেমাটোসিস্ট। কর্ষিকা ও নেমাটোসিস্ট পারস্পরিক সহযোগিতায় আহার সংগ্রহ, চলন এবং আত্মরক্ষায় অংশ নেয়।

- **মুকুল** (Bud) **:** গ্রীষ্মকালে যখন পর্যাপ্ত আহার পাওয়া যায় তখন মুকুল সৃষ্টিরও অনুকূল সময়। এমন পরিবেশে দেহের প্রায় মধ্যবর্তী অঞ্চল থেকে এক বা একাধিক মুকুল সৃষ্টি হয়। প্রত্যেক মুকুল একেকটি নতুন সদস্যের জন্ম দেয়। মুকুলোদগম *Hydra*-র অন্যতম অযৌন জনন প্রক্রিয়া।

- **জননাঙ্গ** (Gonad) **:** হেমন্ত ও শীতকালে দেহকাণ্ডের উপরের অর্ধাংশে এক বা একাধিক কোণাকার **শুক্রাশয়** (testes) এবং নিচের অর্ধাংশে এক বা একাধিক গোলাকার **ডিম্বাশয়** (ovaries) নামক অস্থায়ী জননাঙ্গ দেখা যায়। জননাঙ্গ যৌন জননে অংশ গ্রহণ করে।

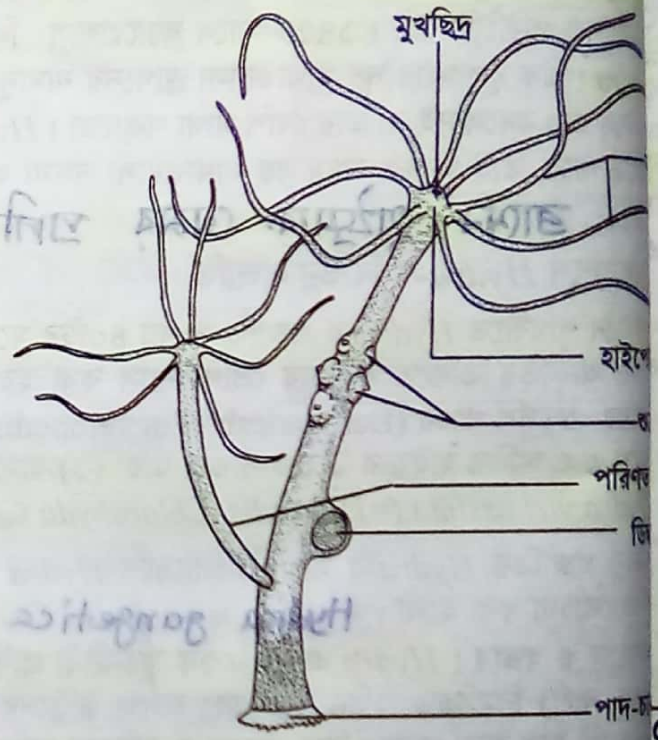

চিত্র ২.১.২ : *Hydra*-র বহির্গঠন (শুক্রাশয়, ডিম্বাশয় ও মুকুল সাথে দেখানো হয়েছে)

৩. পাদ-চাকতি (Pedal disc) : দেহকাণ্ডের নিম্নপ্রান্তে অবস্থিত গোল ও চাপা অংশটি পাদ-চাকতি বা পা… পাদ-চাকতি থেকে ক্ষরিত আঠাল রসের সাহায্যে প্রাণী কোনো তলের সাথে লেগে থাকে। এ চাকতি **বুদবুদ** (bu… সৃষ্টি করে প্রাণীকে ভাসিয়ে রাখতেও সাহায্য করে। চাকতির ক্ষণপদ গঠনকারী কোষের সাহায্যে **গ্লাইডিং চলন** হয়। হাইড্রার দেহের বিভিন্ন অংশকে ২টি ভাগে ভাগ করা যায়:-

দ্বিভ্রূণস্তরী বা দ্বিস্তরবিশিষ্ট প্রাণী (Diploblastic animal)

ভ্রূণাবস্থায় যেসব প্রাণীর দেহপ্রাচীরের কোষগুলো কেবল **এক্টোডার্ম** ও **এন্ডোডার্ম** নামক দুটি নির্দিষ্ট স্তরে থাকে, তাদের **দ্বিভ্রূণস্তরী প্রাণী** বলে। পূর্ণাঙ্গ প্রাণীতে স্তরদুটি যথাক্রমে **এপিডার্মিস** ও **গ্যাস্ট্রোডার্মিস**- এ পরিণত… এই দুই স্তরের মাঝখানে **মেসোগ্লিয়া** নামক **অকোষীয়** ও **জেলির মতো** (কখনও কিছু কোষ ও তন্তুযুক্ত) একটি স্তর… *Hydra* দ্বিভ্রূণস্তরী বা ডিপ্লোব্লাস্টিক প্রাণীর এক চমৎকার উদাহরণ।

স্থায়ী অংশ: ৫টি। পাদচাকতি, দেহকান্ড, হাইপোস্টোম, মুখছিদ্র, কর্ষিকা

অস্থায়ী অংশ: ৩টি (i) মুকুল (এক বা একাধিক), (ii) শুক্রাশয় (১-৮টি)
(iii) ডিম্বাশয় (১টি বা ২টি

Hydra -র অন্তর্গঠন (Internal Structure of Hydra)

Hydra **দ্বিভ্রূণস্তরী** (diploblastic) প্রাণী অর্থাৎ এর কোষস্তর **এপিডার্মিস** ও **গ্যাস্ট্রোডার্মিস** নামক দুটি স্তরে বিন্যস্ত ক যা ভ্রূণাবস্থার এক্টোডার্ম ও এন্ডোডার্ম কোষীয় স্তরের পরিণতি। এদুটি কোষস্তরের মাঝে **মেসোগ্লিয়া** নামে একটি কাষীয় জেলির মতো স্তর থাকে। *Hydra*-র দেহ মূলত **দেহপ্রাচীর** ও **কেন্দ্রীয় পরিপাকসংবহন গহ্বর** astrovascular cavity) বা **সিলেন্টেরন** (coelenteron) নিয়ে গঠিত।

চিত্র ২.১.৩ : *Hydra*-র লম্বচ্ছেদ

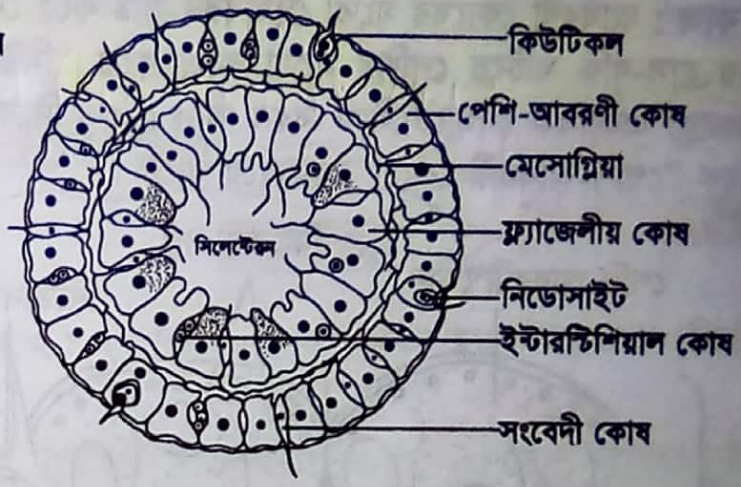

চিত্র ২.১.৪ : *Hydra*-র প্রস্থচ্ছেদ

Hydra-র দেহপ্রাচীরের কোষসমূহ

কোষসমূহ
১. পেশি-আবরণী কোষ ২. ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ ৩. সংবেদী কোষ ৪. স্নায়ু কোষ ৫. গ্রন্থি কোষ ৬. জনন কোষ এবং ৭. নিডোসাইট
কোন কোষস্তর নয়, একে সংযোগকারী স্তর বলা হয়।
১. পুষ্টি কোষ ২. গ্রন্থি কোষ ৩. ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ, ৪. সংবেদী কোষ এবং ৫. স্নায়ু কোষ।

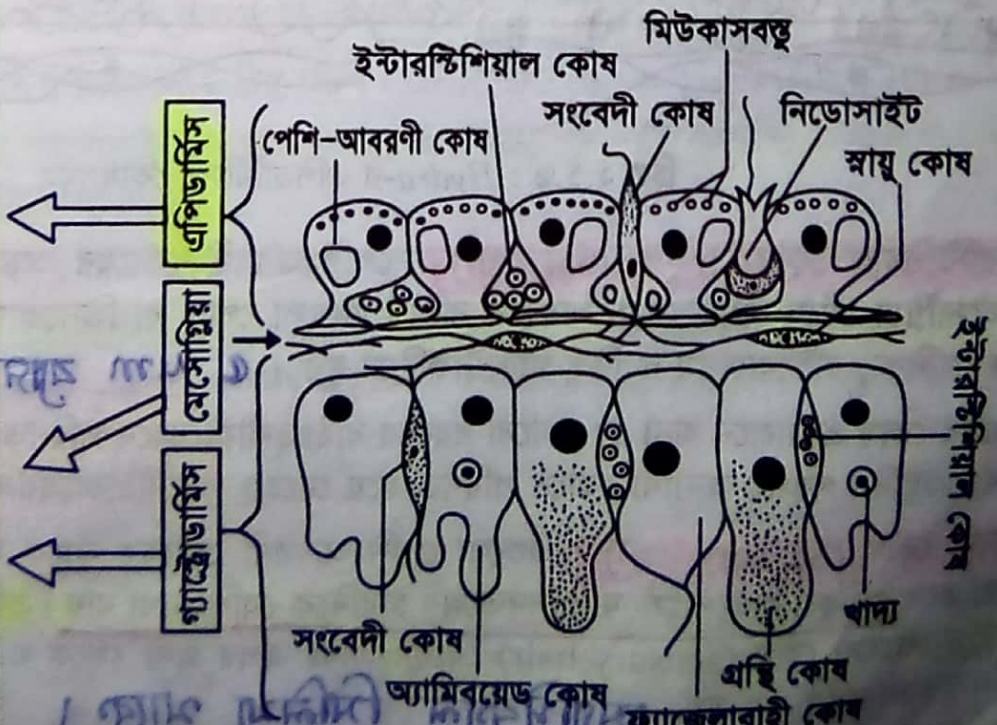

চিত্র ২.১.৫ : *Hydra*-র দেহপ্রাচীরের অংশবিশেষ বিবর্ধিত

এপিডার্মিস (বা বহিঃত্বক)-এর কোষসমূহ

কাজের ভিন্নতা অনুযায়ী *Hydra*-র এপিডার্মিসের কোষের গঠনে ভিন্নতা দেখা যায়। একটি পাতলা **কিউটিকল** (cuticle)-এ আবৃত **এপিডার্মিস** *Hydra*-র বহিরাবরণ গঠন করে। *Hydra*-র এপিডার্মিস নিম্নে ধরনের কোষ নিয়ে গঠিত।

১. পেশি-আবরণী কোষ (Musculo-Epithelial cell) : এপিডার্মিসের সম্পূর্ণ অংশ জুড়ে এ কো করে। বহির্মুখী চওড়া ও অন্তর্মুখী সরু প্রান্তবিশিষ্ট এ কোষগুলো দেখতে কোণাকার। এগুলোর চওড়া প্রা সাইটোপ্লাজমে পূর্ণ, মিউকাস-বস্তুযুক্ত এবং পরস্পর মিলিত হয়ে একটি অভিন্ন আবরণ গঠন করে। ি প্রান্তের শেষে **মায়োনিম** (এক ধরনের নমনীয় ও সংকোচন-প্রসারণশীল তন্তু) নির্মিত দুটি পেশি-প্রবর্ধন সমান্তরালে অবস্থান করে। কর্ষিকায় কোষগুলো বেশ বড় ও চাপা এবং কয়েকটি করে নিডোব্লাস্ট (প নিডোসাইট) ধারণ করে।

কাজ : আবরণী কোষের মতো **দেহাবরণ সৃষ্টি করে** দেহকে রক্ষা করে। প্রবর্ধনগুলো সংকোচন-প্রসার দেহের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিয়ে **পেশির মতো কাজ করে**। মিউকাস দানা কিউটিকল ক্ষরণ করে ও দেহ পি কোষগুলো একাধিক নেমাটোসিস্ট বহন করে। এক দিকে দেহাবরণ, অন্যদিকে পেশির মতো কাজ করে কোষকে "পেশি-আবরণী কোষ" বলা হয়ে থাকে।

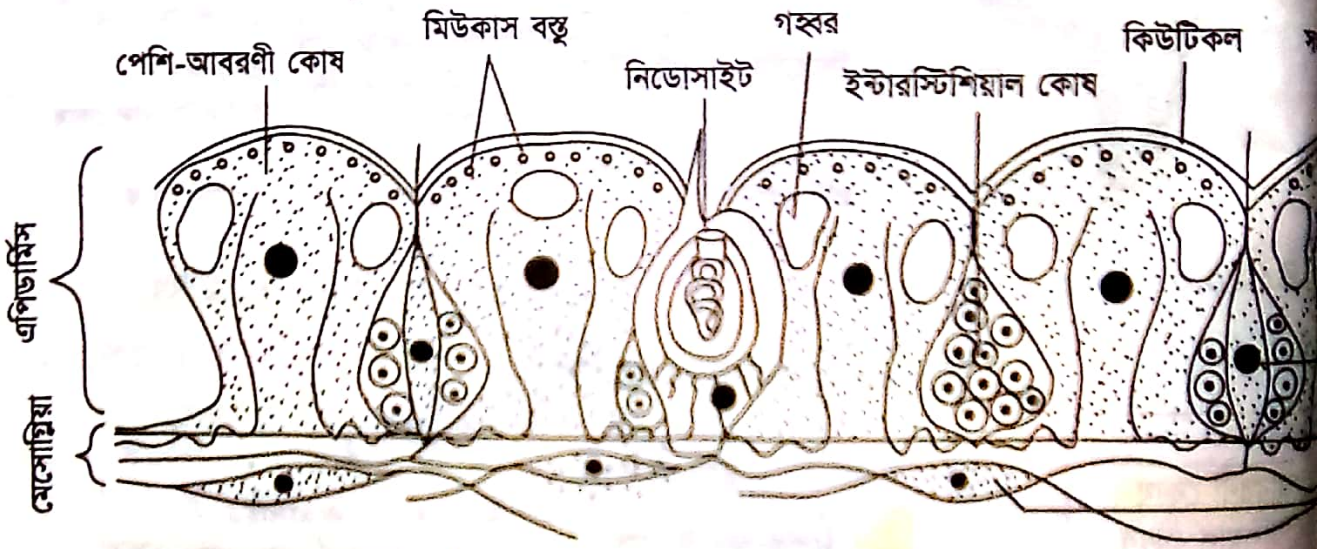

চিত্র ২.১.৬ : *Hydra*-র এপিডার্মিসের কোষসমূহ

২. ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ (Interstitial cell) : পেশি-অবরণী কোষের অন্তর্মুখী সরু প্রান্তের গুচ্ছাকারে, মেসোগ্লিয়া ঘেঁষে এসব কোষ অবস্থান করে। এগুলো গোল বা তিনকোণা এবং সুস্পষ্ট নিউ এন্ডোপ্লাজমিক জালিকা, রাইবোজোম ও কিছু মাইটোকন্ড্রিয়া যুক্ত।

কাজ : এসব কোষ প্রয়োজনে অন্য যে কোনো ধরনের বহিঃত্বকীয় কোষে পরিণত হয়; পুনরুৎপত্তি ও অংশ নেয় এবং কিছুদিন পরপর অন্যান্য কোষে পরিণত হয়ে দেহের পুরনো কোষের স্থান পূরণ করে।

৩. সংবেদী কোষ (Sensory cell) : এগুলো পেশি-আবরণী কোষের ফাঁকে ফাঁকে, সমকোণে ছড়ানো থাকে, তবে কর্ষিকা, হাইপোস্টোম ও পদতলের চারদিকে বেশি দেখা যায়। প্রতিটি কোষ লম্বা প্রান্ত থেকে সূক্ষ্ম **সংবেদী রোম** (sensory hair) বেরোয় এবং অপর প্রান্ত থেকে গুটিকাময় (nodul নির্গত হয়ে স্নায়ুতন্তুর সাথে যুক্ত হয়।

কাজ : পরিবেশ থেকে বিভিন্ন উদ্দীপনা (যেমন আলো, তাপ প্রভৃতি) গ্রহণ করে স্নায়ুকোষে সরবরা

৪. স্নায়ু কোষ (Nerve cell) : এসব কোষ মেসোগ্লিয়া ঘেঁষে অবস্থিত, অনিয়ত আকারবিশি কোষদেহ ও দুই বা ততোধিক সূক্ষ্ম শাখান্বিত স্নায়ুতন্তু নিয়ে গঠিত। তন্তুগুলো পরস্পর মিলে স্নায়ু

কাজ : সংবেদী কোষে সংগৃহীত উদ্দীপনা দেহের বিভিন্ন অংশে সরবরাহ করে।

৫. **গ্রন্থি কোষ** (Gland cell) : এরা লম্বাকৃতি নিঃস্রাবী দানাবিশিষ্ট এক ধরনের পরিবর্তিত এপিডার্মাল কোষ। মুখছিদ্রের চারদিকে ও পাদ-চাকতিতে এদের প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়।

কাজ : মিউকাস ক্ষরণ করে দেহকে কোনো বস্তুর সঙ্গে লেগে থাকতে সাহায্য করে; বুদবুদ সৃষ্টি করে ভাসতে সাহায্য করে; ক্ষণপদ সৃষ্টি করে চলনে অংশ গ্রহণ করে এবং মুখছিদ্রের গ্রন্থিকোষের ক্ষরণ খাদ্য গলাধঃকরণে সাহায্য করে।

৬. **জনন কোষ** (Germ cell) : এসব কোষ জননাঙ্গে অবস্থান করে। জননকোষ দুধরনের **শুক্রাণু** ও **ডিম্বাণু**। পরিণত শুক্রাণু অতি ক্ষুদ্র এবং নিউক্লিয়াসযুক্ত একটি স্ফীত **মস্তক**, সেন্ট্রিওলযুক্ত একটি সংকীর্ণ **মধ্যখন্ড** ও একটি লম্বা বিচলনক্ষম **লেজ** নিয়ে গঠিত। পরিণত ডিম্বাণুটি বড় ও গোল; এর সাথে তিনটি **পোলার বডি** (polar bodies) যুক্ত থাকে।

কাজ : যৌন জননে অংশগ্রহণ করা।

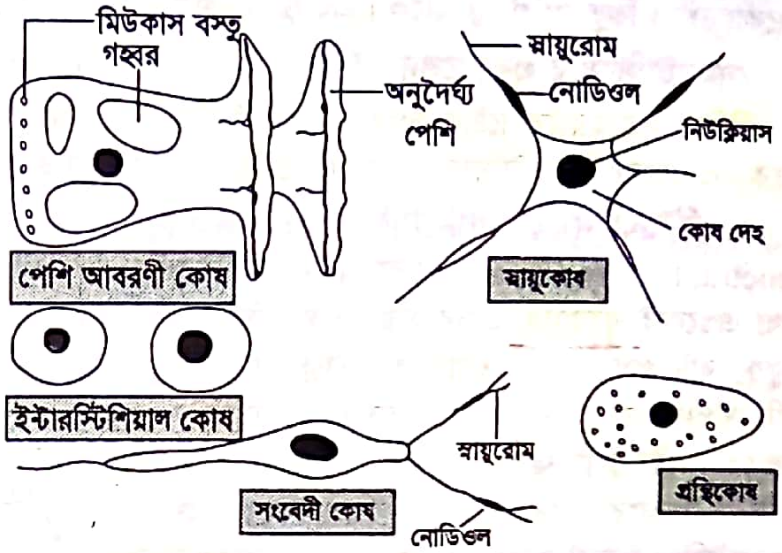

চিত্র ২.১.৭ : *Hydra*-র বহিঃত্বকের কতকগুলো কোষ (বিবর্ধিত)

৭. **নিডোসাইট** (Cnidocyte) : *Hydra*-র পদতল ছাড়া বহিঃত্বকের সর্বত্র বিশেষ করে কর্ষিকার পেশি-আবরণী কোষের ফাঁকে ফাঁকে বা ঐসব কোষের ভিতরে নিডোসাইট অনুপ্রবিষ্ট থাকে। কোষগুলো গোল, ডিম্বাকার বা পেয়ালাকার এবং নিচের দিকে নিউক্লিয়াসবাহী ও দ্বৈত আবরণবেষ্টিত বড় কোষ। কোষের মুক্তপ্রান্তে ক্ষুদ্র, দৃঢ়, সংবেদী **নিডোসিল** (cnidocil) এবং অভ্যন্তরে গহ্বর ও প্যাঁচানো সুতাযুক্ত **নেমাটোসিস্ট** বহন করে। গহ্বরটি **অপারকুলাম** দিয়ে ঢাকা। আদর্শ নেমাটোসিস্টের সুতার গোড়ায় ৩টি বড় কাঁটার মতো **বার্ব** (barb) থাকে এবং গহ্বরটি **হিপনোটক্সিন** (hipnotoxin) নামক বিষাক্ত রসে পূর্ণ। পরিস্ফুটনরত নিডোসাইটকে **নিডোব্লাস্ট** (cnidoblast) বলে।

কাজ : নিডোসাইটের নেমাটোসিস্ট অঙ্গাণু প্রাণীর খাদ্য গ্রহণ, চলন ও আত্মরক্ষায় ব্যবহৃত হয়।

আদর্শ নিডোসাইটের গঠন (Structure of a typical Cnidocyte)

Hydra-র একটি আদর্শ নিডোসাইট দেখতে গোল, ডিম্বাকার, নাশপাতি আকার, পেয়ালাকার বা লাটিম আকৃতির এবং নিচে বর্ণিত অংশগুলো নিয়ে গঠিত।

১. **আবরণ** (Membrane) : প্রতিটি কোষ দ্বিস্তরী আবরণে আবৃত। স্তরদুটির মাঝখানে দানাদার সাইটোপ্লাজম এবং কোষের গোড়ার দিকে একটি নিউক্লিয়াস থাকে।

২. **নেমাটোসিস্ট** (Nematocyst) : কোষের অভ্যন্তরে অবস্থিত ও সূত্রকযুক্ত থলিটির নাম নেমাটোসিস্ট। আদর্শ নিডোসাইটে থলিটি আমিষ ও ফেনল-এর সমন্বয়ে গঠিত বিষাক্ত তরল **হিপনোটক্সিন** (hipnotoxin) দিয়ে পূর্ণ থাকে। লম্বা, সরু, ফাঁপা সূত্রকটি থলির অগ্র প্রান্তে লাগানো থাকে। সূত্রকের চওড়া গোড়াটিকে **বাট** (butt) বা **শ্যাফট** (shaft) বলে। এতে তিনটি বড় তীক্ষ্ণ কাঁটার মতো **বার্ব** (barb) এবং সর্পিলাকারে বিন্যস্ত ক্ষুদ্রতর কাঁটার মতো অসংখ্য **বার্বিউল** (barbules) দেখা যায়। স্বাভাবিক অবস্থায় সূত্রকটি বাট ও কাঁটাসহ থলির ভিতর ঢুকানো থাকে।

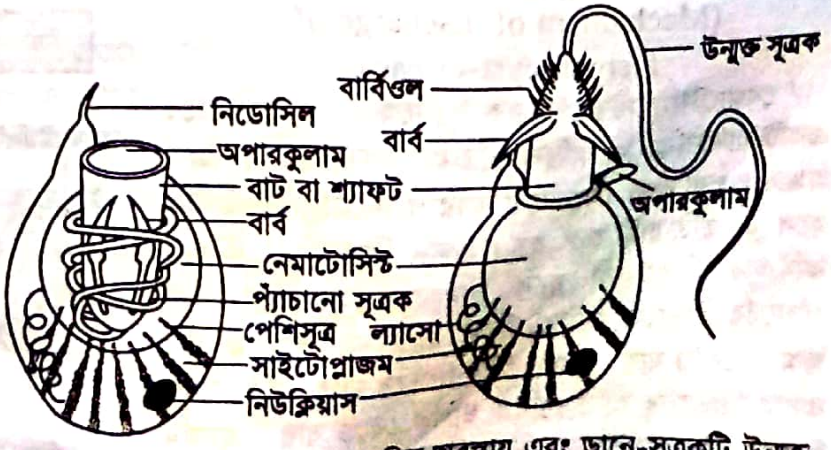

চিত্র ২.১.৮ : নিডোসাইট; বামে–স্বাভাবিক অবস্থায় এবং ডানে–সূত্রকটি উন্মুক্ত

৩. অপারকুলাম (Operculum) : স্বাভাবিক অবস্থায় নেমাটোসিস্টের সূত্রক ও থলি যে ঢাকনা দিয়ে আবৃত থাকে তার নাম অপারকুলাম। উন্মুক্ত অবস্থায় এটি পাশে সরে যায়।

৪. নিডোসিল (Cnidocil) : নিডোসাইট কোষের মুক্ত প্রান্তের শক্ত, দৃঢ়, সংবেদনশীল কাঁটাটি নিডোসিল ট্রিগারের মতো কাজ করে ফলে প্যাঁচানো সূত্রকটি বাইরে বেরিয়ে আসে।

৫. পেশিতন্তু ও ল্যাসো (Muscle fibre & Lasso) : কোষের সাইটোপ্লাজম ও নেমাটোসিস্টের সংকোচনশীল কিছু পেশিতন্তু থাকে। এছাড়াও কোষের নিচের প্রান্তে ল্যাসো নামের একটি প্যাঁচানো সূত্রক দেখা যায়।

নেমাটোসিস্টের প্রকারভেদ (Types of Nematocysts)

নিক্ষিপ্ত সূত্রকের বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে বিজ্ঞানী **ভার্ণার** (Werner) ১৯৬৫ সালে নিডারিয়া জাতীয় প্রাণিদের থেকে ২৩ ধরনের নেমাটোসিস্ট শনাক্ত করেছেন। এর মধ্যে নিম্নোক্ত চার ধরনের নেমাটোসিস্ট *Hydra*-য় পাওয়া যায়।

১. **স্টিনোটিল বা পেনিট্র্যান্ট** (Stenotile or Penetrant) : *Hydra*-র চার ধরনের নেমাটোসিস্টের মধ্যে এগুলোই বৃহত্তম। এদের সূত্রক লম্বা, ফাঁপা, শীর্ষ উন্মুক্ত, বাট প্রশস্ত এবং তিনটি বড় তীক্ষ্ণ বার্ব ও তিন সারি সর্পিলাকারে সজ্জিত অতি ক্ষুদ্র বার্বিউলযুক্ত। এর ভিতরে **হিপনোটক্সিন** নামক বিষাক্ত তরল থাকে। শিকারের দেহে সূত্রক বিদ্ধ করে বিষাক্ত হিপনোটক্সিন প্রবেশ করিয়ে তাকে অজ্ঞান ও অবশ করে ফেলে।

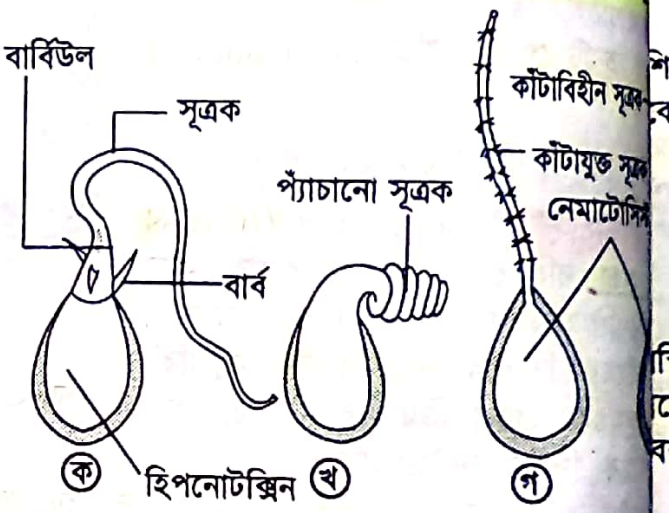

চিত্র ২.১.৯ : বিভিন্ন ধরনের নেমাটোসিস্ট; ক. স্টিনোটিল, খ. ভলভেন্ট, গ. স্ট্রেপটোলিন গ্লুটিন্যান্ট ও ঘ. স্টেরিওলিন গ্লুটিন্যান্ট

২. **ভলভেন্ট** (Volvent) : এগুলো অপেক্ষাকৃত ছোট। সূত্রকটি খাটো, মোটা, স্থিতিস্থাপক, কাঁটাবিহীন এবং বন্ধ শীর্ষযুক্ত নেমাটোসিস্ট। ক্যাপসুলের ভিতর সূত্রকের একটি মাত্র প্যাঁচ থাকে, কিন্তু নিক্ষিপ্ত হওয়ার সাথে সাথে কর্ক-স্ক্রুর মতো অনেকগুলো প্যাঁচের সৃষ্টি করে। এটি শিকার কিংবা কোন বস্তুকে আঁকড়ে ধরে রাখতে করে।

৩. **স্ট্রেপটোলিন গ্লুটিন্যান্ট** (Streptoline glutinant) : এর সূত্রক লম্বা, সর্পিলাকারে সজ্জিত কাঁটাযুক্ত সুগঠিত নয় এবং শীর্ষদেশ উন্মুক্ত। এগুলো আঠালো রস ক্ষরণ করে চলনে এবং শিকার আটকাতে সাহায্য করে।

৪. **স্টেরিওলিন গ্লুটিন্যান্ট** (Stereoline glutinant) : এগুলো ক্ষুদ্রতম নেমাটোসিস্ট; সূত্রক লম্বা, কাঁটাবিহীন সুগঠিত নয় এবং শীর্ষদেশ উন্মুক্ত। এগুলোও এক ধরনের আঠালো রস ক্ষরণ করে চলন ও শিকার আটকে রাখতে করে।

নেমাটোসিস্ট-এর সূত্রক নিক্ষেপের কৌশল (Mechanism of discharge of Nematocyst-thread)

নেমাটোসিস্টের সূত্রক নিক্ষেপ যুগপৎভাবে একটি রাসায়নিক ও যান্ত্রিক প্রক্রিয়া। শিকারের বা শত্রুর সন্ধান অথবা অন্য যেকোনো কারণে নিডোসাইট উদ্দীপ্ত হলে এ প্রক্রিয়াটি শুরু হয়। কোন শিকার *Hydra*-র কর্ষিকার নিকটবর্তী হলে শিকার-দেহের রাসায়নিক পদার্থের প্রভাবে নেমাটোসিস্ট প্রাচীরের পানিভেদ্যতা ক্ষমতা বেড়ে যায়। এতে থলির ভিতরে দ্রুত পানি প্রবেশ করায় ভিতরের অভিস্রবণিক চাপও বেড়ে যায়। এসময় শিকার নিডোসাইটের নিডোসিল স্পর্শ করামাত্র এর

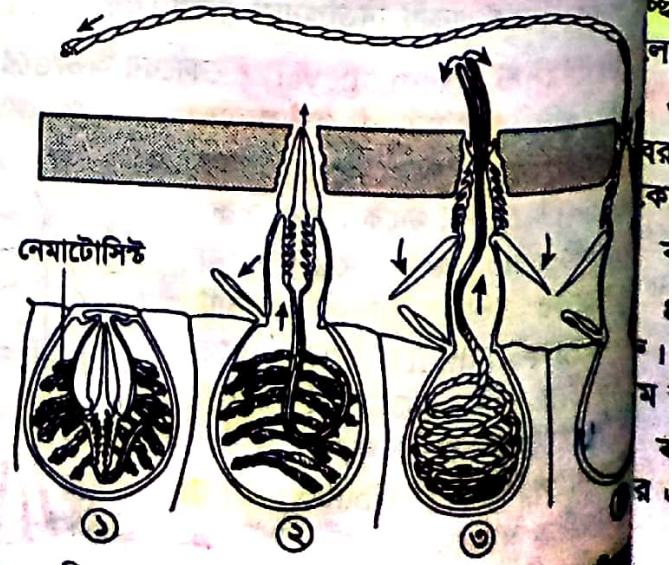

চিত্র ২.১.১০ : নেমাটোসিস্টের সূত্রক নিক্ষেপ

অপারকুলাম খুলে যায় এবং তখন দ্রুত পানি ভিতরে প্রবেশ করায় হাইড্রোস্ট্যাটিক চাপ বেড়ে গেলে নেমাটোসিস্ট-সূত্রক ক্ষিপ্ত গতিতে বাইরে নিক্ষিপ্ত হয়।

নেমাটোসিস্টের **সূত্রক একবার নিক্ষিপ্ত হলে সেটাকে আর নিডোসাইটে ফিরিয়ে আনা যায় না** বা আবার ব্যবহার করা যায় না কিংবা ঐ একই নিডোসাইট আর কোনো নেমাটোসিস্ট সৃষ্টিও করতে পারে না। এ ধরনের নিডোসাইট ধীরে ধীরে গ্যাস্ট্রোভাস্কুলার গহ্বরে প্রবেশ করে এবং অন্যান্য খাদ্যবস্তুর সাথে হজম হয়ে যায়। ৪৮ ঘন্টার মধ্যে নতুন নিডোসাইট সৃষ্টির মাধ্যমে ব্যবহৃত নিডোসাইট প্রতিস্থাপিত হয়।

গ্যাস্ট্রোডার্মিস (বা অন্তঃত্বক)-এর কোষসমূহ

এপিডার্মিস অপেক্ষা গ্যাস্ট্রোডার্মিস-এর গঠন অনেকটা সরল এবং নিচের পাঁচ ধরনের কোষ নিয়ে গঠিত।

১. **পুষ্টি কোষ বা পেশি-আবরণী কোষ** (Nutritive cell or Musculo-Epithelial Cells) : গ্যাস্ট্রোডার্মিসের বেশির ভাগ অংশ জুড়ে থাকে কোষ পুষ্টি। প্রতিটি কোষ স্তম্ভাকার এবং একটি বড় নিউক্লিয়াস ও গহ্বরযুক্ত। সংযুক্ত প্রান্ত থেকে সূক্ষ্ম, সংকোচনশীল তন্তুবিশিষ্ট পেশি প্রবর্ধন সৃষ্টি হয়ে মেসোগ্লিয়ার সমকোণে অবস্থান করে।

ভিতরের মুক্ত প্রান্তের গঠনের উপর ভিত্তি করে পুষ্টি কোষগুলোকে দুভাগে ভাগ করা যায়, যথা–

i. **ফ্ল্যাজেলীয় কোষ** (Flagellated cell) : এগুলোর মুক্ত প্রান্তে ১–৪টি সুতার মতো ফ্ল্যাজেলা সংযুক্ত থাকে।

ii. **ক্ষণপদীয় কোষ** (Pseudopodial cell) : এগুলোর মুক্ত প্রান্ত ক্ষণপদযুক্ত।

কাজ : পেশি প্রবর্ধনগুলো সংকোচন-প্রসারণের মাধ্যমে দেহকে সরু ও মোটা করে। মুখ ও কর্ষিকার গোড়ায় অবস্থিত পেশি-প্রবর্ধনগুলো নিজের ছিদ্র বন্ধ করতে **স্ফিংক্টার** (sphincter)-এর মতো কাজ করে। ফ্ল্যাজেলীয় কোষের ফ্ল্যাজেলা আন্দোলিত হয়ে খাদ্যবস্তু ক্ষুদ্র কণায় পরিণত করে। প্রয়োজনে এ কোষ আন্দোলিত হয়ে মুখছিদ্রপথে পানি প্রবেশ করায়। ক্ষণপদীয় কোষের ক্ষণপদ খাদ্যকণা গলাধঃকরণ করে অন্তঃস্থ খাদ্যগহ্বরে পরিপাক করে।

২. **গ্রন্থি কোষ** (Gland cell) : বিক্ষিপ্তভাবে পুষ্টিকোষের ফাঁকে ফাঁকে এসব কোষ অবস্থান করে। এগুলোর সংখ্যা মূল দেহ এবং হাইপোস্টোমে সর্বাধিক, পদতলে স্বল্প এবং কর্ষিকায় অনুপস্থিত। গ্রন্থিকোষ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও পেশি-প্রবর্ধনবিহীন। এগুলো দুরকম হয়ে থাকে–

i. **মিউকাস ক্ষরণকারী** (Mucous secreting) : এগুলো প্রধানত হাইপোস্টোম অঞ্চলে অবস্থিত এবং পিচ্ছিল মিউকাস ক্ষরণ করে।

ii. **এনজাইম ক্ষরণকারী** (Enzyme secreting) : অন্যান্য স্থানের কোষগুলো এ ধরনের যা থেকে পরিপাকের জন্য এনজাইম ক্ষরিত হয়।

কাজ : হাইপোস্টোমের গ্রন্থিকোষ নিঃসৃত মিউকাস খাদ্যদ্রব্য পিচ্ছিল করে গলাধঃকরণে সাহায্য করে। অন্যান্য স্থানে গ্রন্থিকোষ সিলেন্টেরণে এনজাইম-এর ক্ষরণ ঘটিয়ে পরিপাকে সাহায্য করে।

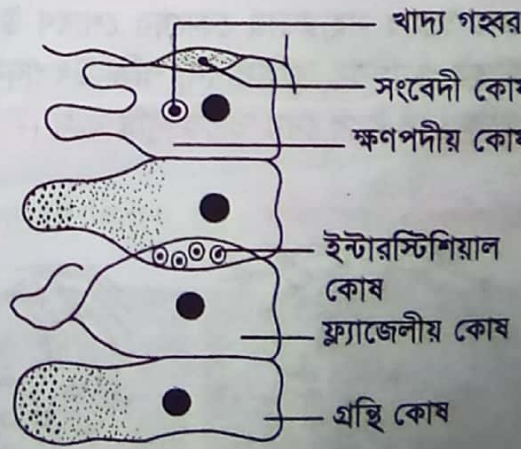

চিত্র ২.১.১১ : *Hydra*-র অন্তঃত্বকের কোষসমূহ

৩. **ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ** (Interstitial cell) : এগুলো পেশি-আবরণী কোষের ফাঁকে ফাঁকে অবস্থান করে। প্রকৃতপক্ষে এসব কোষ এপিডার্মিস থেকে আগত কোষ। এগুলো গোল বা ত্রিকোণাকার এবং সুস্পষ্ট নিউক্লিয়াস, মসৃণ এণ্ডোপ্লাজমিক জালিকা, মুক্ত রাইবোসোম ও কিছু মাইটোকন্ড্রিয়া বহন করে।

কাজ : এন্ডোডার্মিসের প্রয়োজনীয় যে কোনো কোষ গঠন করাই এর কাজ।

৪. **সংবেদী কোষ** (Sensory cell) : এগুলো পেশি-আবরণী কোষের ফাঁকে ফাঁকে অবস্থিত। প্রতিটি কোষ লম্বা ও সরু। কোষের মুক্ত প্রান্ত থেকে নির্গত সূক্ষ্ম সংবেদী রোম সিলেন্টেরণে উদগত এবং মেসোগ্লিয়া সংলগ্ন প্রান্ত থেকে নির্গত একটি স্নায়ুতন্তুর সাথে যুক্ত থাকে।

কাজ : সম্ভবত পানির সাথে সিলেন্টেরনে প্রবেশিত খাদ্য ও অন্যান্য পদার্থের গুণাগুণ যাচাই করে স্নায়ুকোষে প্রেরণ করে এবং স্নায়ুকোষ উপযুক্ত প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে।

Hydra-র নামকরণ, বিভিন্ন প্রজাতি, প্রস্থচ্ছেদ-লম্বচ্ছেদ, নিডোসাইট, চলন, মুকুলোদগম ও পুনরুৎপাদন

গ্রিক রূপকথায় বর্ণিত নয় মাথাওয়ালা জানোয়ার Hydra

হারকিউলিস Hydra-র একটি মাথা কাটলে সেখানে দুই বা তারও বেশি মাথা গজাতো

Hydra-র অন্তঃকোষীয় ও বহিঃকোষীয় পরিপাকের মধ্যে পার্থক্য

১। **সংঘটন স্থান:** কোষের অভ্যন্তরে খাদ্যগহ্বরের মধ্যে খাদ্যবস্তুর অন্তঃকোষীয় পরিপাক ঘটে। কোষের বাইরে সিলেন্টেরন, পাকস্থলী বা অন্ত্রের লুমেনে খাদ্যবস্তুর বহিঃকোষীয় পরিপাক ঘটে।

২। **খাদ্যগহ্বর:** অন্তঃকোষীয় পরিপাকের ক্ষেত্রে খাদ্যগহ্বর সৃষ্টি হয়। বহিঃকোষীয় পরিপাকের ক্ষেত্রে খাদ্যগহ্বর সৃষ্টি হয় না।

৩। **এনজাইম:** অন্তঃকোষীয় পরিপাকে অন্তঃকোষীয় এনজাইম ব্যবহৃত হয়। বহিঃকোষীয় পরিপাকে বিভিন্ন উৎসের এনজাইম ব্যবহৃত হয়।

৪। **শোষণ ও পরিবহন:** অন্তঃকোষীয় পরিপাকে কোষের সাইটোপ্লাজমে খাদ্যসার শোষিত হয়, কোনো পরিবহন ঘটে না। বহিঃকোষীয় পরিপাকে খাদ্যবস্তু সংবহনতন্ত্রের মাধ্যমে পরিবাহিত হওয়ার পর বিভিন্ন কোষ কর্তৃক শোষিত হয়।

৫। **বর্জ্য নিষ্কাশন:** অন্তঃকোষীয় পরিপাকে খাদ্যের অপাচ্য বর্জ্য কলারসে নিক্ষিপ্ত হয়। বহিঃকোষীয় পরিপাকে খাদ্যের অপাচ্য অংশ নির্দিষ্ট নালি পথে নিক্ষিপ্ত হয়।

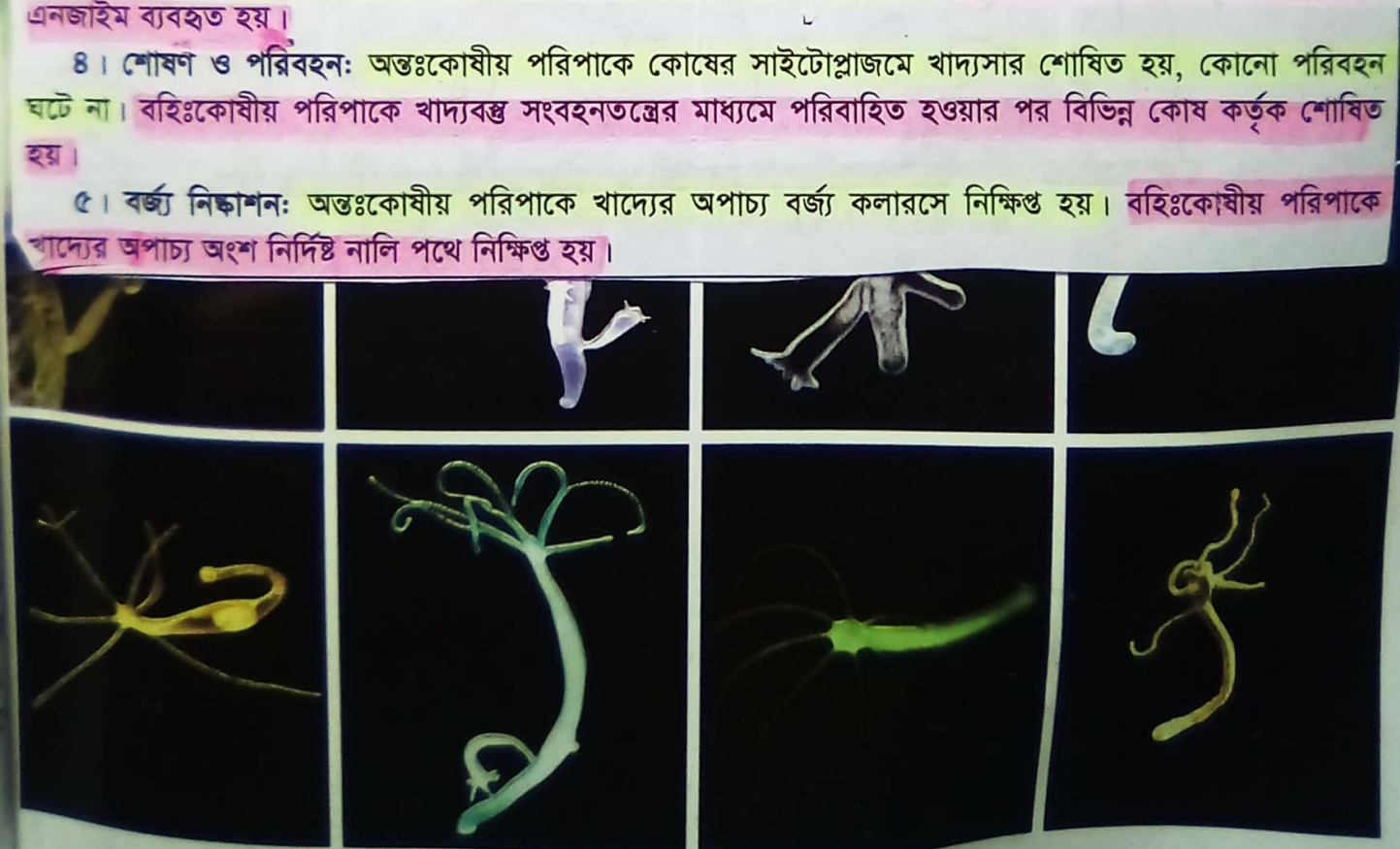

চিত্র ঃ নানা প্রজাতির *Hydra*

৫. **স্নায়ু কোষ** (Nerve cell) : এসব কোষ মেসোগ্লিয়া ঘেঁষে অবস্থিত, সংখ্যায় খুব কম। অনিয়ত আকা এবং একটি ক্ষুদ্র কোষদেহ ও দুই বা ততোধিক সূক্ষ্ম শাখান্বিত তন্তু নিয়ে গঠিত। তন্তুগুলো পরস্পর মিলে স্নায়ু-জ গঠন করে।

কাজ : সংবেদী কোষে সংগৃহীত উদ্দীপনা স্থানান্তর করাই এর কাজ।

মেসোল্যামিলা /মেসোগ্লিয়া (Mesogloea)

Hydra-র এপিডার্মিস ও গ্যাস্ট্রোডার্মিসের মাঝখানে অবস্থিত জেলির মতো, স্বচ্ছ, স্থিতিস্থাপক স্তরকে মেসে বলে। মেসোগ্লিয়া স্তরটি দেহ ও কর্ষিকা উভয় স্থানে বিস্তৃত, তবে কর্ষিকায় সবচেয়ে পাতলা এবং পাদ-চাকতিতে স পুরু। মেসোগ্লিয়ার এ ধরনের বিন্যাস পাদ-চাকতির অতিরিক্ত যান্ত্রিক প্রসারণ প্রতিরোধে সাহায্য করে এবং কর্ষি অধিকতর নমনীয়তা দান করে। *Hydra*-র মেসোগ্লিয়া প্রায় ০.১ মাইক্রোমিটার পুরু। এপিডার্মি গ্যাস্ট্রোডার্মিস উভয় স্তরের কোষ মেসোগ্লিয়া গঠনে অংশ গ্রহণ করে। ব্যাস বিশিষ্ট

কাজ : (i) মেসোগ্লিয়া দেহের অবলম্বনে সহায়তা করে এবং এক ধরনের নমনীয় **কঙ্কাল** হিসেবে কাজ করে। মেসোগ্লিয়া দুটি কোষস্তরের **ভিত্তিরূপে** কাজ করে। (iii) স্নায়ুকোষ ও সংবেদী কোষতন্তুসমূহ এবং পেশি-আবরণী ক সংকোচনশীল মায়োফাইব্রিল ধারণ করে। (iv) মেসোগ্লিয়ায় অবস্থিত পেশি-আবরণী কোষের সংকোচ মায়োফাইব্রিলের সংকোচনে দেহ বা কর্ষিকা খাটো হয় ফলে দেহ বাঁকানো সম্ভব হয়।

সিলেন্টেরন (Coelenteron)

Hydra-র দেহের কেন্দ্রে অবস্থিত ফাঁকা গহ্বরকে **সিলেন্টেরন** বলে। এটি গ্যাস্ট্রোডার্মিসে পরিবৃত থাকে। খাদ্যের বহিঃকোষীয় পরিপাক ঘটে এবং খাদ্যসার, শ্বসন ও রেচন পদার্থ পরিবাহিত হয় বলে একে **গ্যাস্ট্রোভ গহ্বর** (gastrovascular cavity) বা **পরিপাকসংবহন গহ্বর** বলা হয়। কর্ষিকায় সিলেন্টেরন প্রসারিত থাকে এগুলো ফাঁপা হয়। দেহের উপরিভাগে অবস্থিত একমাত্র **মুখছিদ্রের** মাধ্যমে সিলেন্টেরন বাইরে উন্মুক্ত হয়।

Hydra-র খাদ্য গ্রহণ ও পরিপাক প্রক্রিয়া (Feeding and Digestion)

পুষ্টি (Nutrition) : যে জৈবনিক প্রক্রিয়ায় প্রাণী নিজ পরিবেশ থেকে প্রয়োজনীয় জটিল খাদ্য গ্রহণ করে এনজাইমের সহায়তায় কোষের শোষণ উপযোগী সরল খাদ্যে পরিণত করে পরিপাককৃত খাদ্যসার শোষণের ম দেহের ক্ষয়পূরণ, বৃদ্ধিসাধন, শক্তি উৎপাদন ইত্যাদি শারীরবৃত্তীয় কার্যকলাপ অক্ষুণ্ন রাখে এবং খাদ্যের অপাচ্য অং থেকে বের করে দেয় তাকে পুষ্টি বলে।

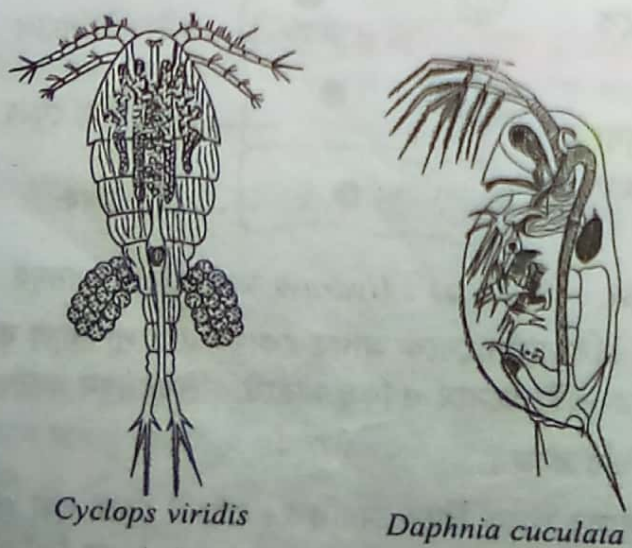

Cyclops viridis *Daphnia cuculata*

চিত্র ২.১.১২ : *Hydra*-র প্রধান খাদ্য

***Hydra*-র খাদ্য :** *Hydra* মাংসাশী (carnivo প্রাণী। যে সব ক্ষুদ্র জলজপ্রাণীকে নেমাটোসিস্ট দিয়ে স কাবু করা যায়, সে সব প্রাণী *Hydra*-র প্রধান খাদ্য। *Hy* র খাদ্য তালিকার বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে বিভিন্ন পতঙ্গের *Cyclops* (সাইক্লপস) ও *Daphnia* (ড্যাফনিয়া) ক্রাস্টাসীয় সন্ধিপদী প্রাণী (Arthropods), ছোট ছোট খণ্ডকায়িত প্রাণী (Annelids) ও মাছের ডিম। তবে প্রধা হচ্ছে ক্ষুদ্র ক্রাস্টাসীয় সন্ধিপদী।

খাদ্য গ্রহণ পদ্ধতি : ক্ষুধার্ত *Hydra* পদতলকে ভিত্তি আটকে নির্দিষ্ট এলাকা জুড়ে মূলদেহ ও কর্ষিকাগুলো শিকারের অপেক্ষায় থাকে। কোনো খাদ্যপ্রাণী বা শিকা আসামাত্র কর্ষিকার নেমাটোসিস্টগুলো উদ্দীপ্ত হয়ে উঠে শিকার কর্ষিকা স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন নেমাটোসিস্ট-সূত্র নিক্ষিপ্ত হয়।

ভলভেন্ট নেমাটোসিস্ট-সূত্রক শিকারের উপাঙ্গ জড়িয়ে গতিরোধ করে এবং **গ্লুটিন্যান্ট**গুলো আঠালো রস ক্ষরণ করে আটকে ফেলে। **স্টিনোটিল** নেমাটোসিস্ট তখন শিকারের দেহে হিপনোটক্সিন প্রবেশ করিয়ে শিকারকে অবশ করে দেয়। এরপর স্পর্শিকা সেটিকে মুখের কাছে নিয়ে আসে। মুখছিদ্র স্ফীত ও চওড়া হয়ে তা গ্রহণ করে। মুখের চারদিকে অবস্থিত গ্রন্থিকোষ নিঃসৃত মিউকাসে সিক্ত ও পিচ্ছিল হয়ে এবং হাইপোস্টোম ও দেহপ্রাচীরের সংকোচন-প্রসারণের ফলে খাদ্য সিলেন্টেরনে এসে পৌঁছে।

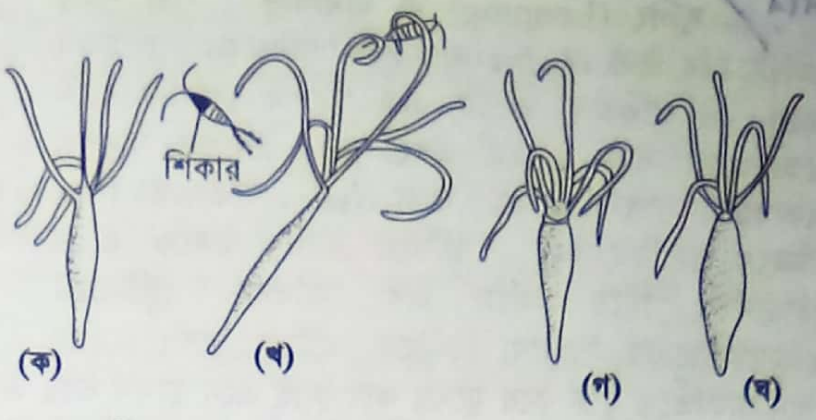

চিত্র ২.১.১৩ : *Hydra*-র শিকার ধরার কৌশল

***Hydra*-র খাদ্য পরিপাক প্রণালী** (Process of Digestion) : **যে জৈব-রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় জটিল জৈব খাদ্যবস্তু বিভিন্ন এনজাইমের সাহায্যে ভেঙ্গে তরল, সরল ও কোষের শোষণ উপযোগী হয়, তাকে পরিপাক বলে।** *Hydra*-র খাদ্য পরিপাকের সময় অন্তঃত্বকের গ্রন্থিকোষ থেকে এনজাইম নিঃসৃত হয়। পরিপাক দুটি ধাপে সম্পন্ন হয়:

১. **বহিঃকোষীয় পরিপাক** (Extracellular digestion): কোষের বাইরে খাদ্যবস্তুর পরিপাককে বহিঃকোষীয় বা **অন্তঃকোষীয় পরিপাক** বলে। খাদ্য সিলেন্টেরনে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে মুখছিদ্র বন্ধ হয়ে যায় এবং অন্তঃত্বকীয় গ্রন্থিকোষগুলো সক্রিয় হয়। কোষগুলো বড় ও দানাদার হয়ে উঠে এবং এনজাইম ক্ষরণ করে। প্রথমে এনজাইমের প্রভাবে শিকারের মৃত্যু ঘটে। দেহপ্রাচীরের প্রবল সংকোচন-প্রসারণের ফলে শিকারটি ছোট ছোট কণায় পরিণত হয়। এ সময় অন্তঃত্বকীয় কোষের ফ্ল্যাজেলা সঞ্চালিত হয়ে খাদ্যকণাকে এনজাইমের সাথে ভালভাবে মিশ্রিত করে। গ্রন্থিকোষ থেকে নিঃসৃত এনজাইমের প্রভাবে খাদ্যকণা পরিপাক হতে থাকে। পেপসিন নিঃসৃত হয়ে প্রোটিনকে **পলিপেপটাইড**-এ পরিণত করে। লিপিড ও শর্করা খাদ্যাংশের কোনো পরিবর্তন হয় না ।

২. **অন্তঃকোষীয় পরিপাক** (Intracellular digestion) : দেহের সংকোচন-প্রসারণের ফলে খাদ্য আরও ক্ষুদ্র কণায় পরিণত হয়। তখন পেশি-অন্তঃআবরণীর ক্ষণপদীয় কোষগুলো ক্ষণপদ বের করে কিছু কিছু খাদ্যকণা সামান্য তরল পদার্থের সাথে কোষীয় ভক্ষণ প্রক্রিয়ায় (ফ্যাগোসাইটোসিস) গলাধঃকরণ করে। খাদ্যকণা তখন কোষের অভ্যন্তরে খাদ্যগহ্বরে সাইটোপ্লাজম থেকে নিঃসৃত এনজাইমের সাহায্যে পরিপাক হয়। খাদ্যগহ্বরে প্রথমে সাইটোপ্লাজম থেকে এসিড নিঃসৃত হয়ে খাদ্যকে আম্লিক করে। পরে ক্ষারীয় রস নিঃসৃত হয়ে ক্ষারীয় মাধ্যম সৃষ্টি হলে সাইটোপ্লাজম থেকে বিভিন্ন এনজাইম নিঃসৃত হয়। **ট্রিপসিন** আমিষ জাতীয় খাদ্যকে অ্যামিনো এসিডে, **লাইপেজ** স্নেহজাতীয় খাদ্যকে ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারলে এবং **অ্যামাইলেজ** শর্করাকে গ্লুকোজে পরিণত করে। খাদ্যগহ্বরে খাদ্য সম্পূর্ণরূপে পরিপাক হয়। *Hydra* আমিষ, স্নেহ ও কিছু শর্করা জাতীয় খাদ্য পরিপাক করতে পারে কিন্তু শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য পরিপাক করতে পারে না।

পরিশোষণ, আত্মীকরণ ও বর্জন : খাদ্যের পরিপাককৃত সারাংশ সাইটোপ্লাজমে পরিশোষিত হয়ে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় সমগ্র দেহের বিভিন্ন কোষে বাহিত হয়। অপাচ্য খাদ্যাংশ দেহপ্রাচীরের সংকোচন-প্রসারণ ও ফ্লাজেলার সঞ্চালনের ফলে মুখছিদ্র দিয়ে বহিঃগামী পানির স্রোতের সঙ্গে মিশে দেহের বাইরে বর্জিত হয়।

Hydra-র চলন (Locomotion)

যে প্রক্রিয়ায় জীবদেহ জৈবিক প্রয়োজনে নিজ প্রচেষ্টায় স্থানান্তরিত হয়, তাকে চলন বলে। সাধারণত এটি প্রাণীর একটি স্বতঃস্ফূর্ত সহজাত আচরণ। প্রতিকূল পরিবেশ মোকাবিলায়, জনন, খাদ্য সংগ্রহ, আত্মরক্ষা, বিনোদন প্রভৃতি কারণে জীব স্থানান্তরে গমন করে। *Hydra* সাধারণত নিমজ্জিত বস্তু বা উদ্ভিদের গায়ে সংলগ্ন থাকে, তবে তাকে বিভিন্ন কারণে দেহকে সাড়া দেয়ার জন্য বা খাদ্য গ্রহণের জন্য স্থান ত্যাগ করতে হয়। কোনো নির্দিষ্ট চলন অঙ্গ না থাকায় সমগ্র দেহটি বিভিন্নভাবে প্রধানত দেহের সংকোচন-প্রসারণশীল পেশিতন্তু ও নেমাটোসিস্টের সাহায্যে সম্পন্ন হয়। চলনের জন্য প্রথমে সংবেদী কোষ সাড়া দেয় এবং সে বার্তা বহিঃত্বক ও অন্তঃত্বকের স্নায়ু-জালকের ভিতর সঞ্চালিত হয়। ফলে পেশিতন্তু সঙ্কুচিত হয় এবং চলন প্রক্রিয়া শুরু হয়। *Hydra*-য় নিচে বর্ণিত বিভিন্ন ধরনের চলন দেখতে পাওয়া যায়।

ক্যাটার পিলার লার্ভার মত চলন

১. **লুপিং** (Looping) বা **হামাগুড়ি** : লম্বা দূরত্ব অতিক্রমের জন্য *Hydra* সাধারণত হামাগুড়ির সাহায্যেই চলে। এ প্রক্রিয়ার শুরুতে এক পাশের পেশি-আবরণী কোষগুলো সঙ্কুচিত হয় এবং অপর পাশের অনুরূপ কোষগুলো সম্প্রসারিত হয়। ফলে *Hydra* গতিপথের দিকে দেহকে প্রসারিত করে ও বাঁকিয়ে মৌখিক তলকে ভিত্তির কাছাকাছি নিয়ে আসে এবং কর্ষিকার **গ্লুটিন্যান্ট** নেমাটোসিস্টের সাহায্যে ভিত্তিকে আটকে ধরে। এরপর পাদ-চাকতিকে মুক্ত করে মুখের কাছাকাছি এনে স্থাপন করে এবং কর্ষিকা বিযুক্ত করে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। এ পুনারাবৃত্তি ঘটিয়ে *Hydra* স্থান ত্যাগ করে। এ চলন কিছুটা শুঁয়াপোকার গমন পদ্ধতির মতো দেখায়।

চিত্র ২.১.১৪ : লুপিং চলন

অ্যাক্রোবেটদের মত চলন

২. **সমারসল্টিং** (Somersaulting) বা **ডিগবাজী** : এটি *Hydra*-র সাধারণ ও **দ্রুত চলন প্রক্রিয়া**। এ শুরুতে *Hydra* দেহকে বাঁকিয়ে চলনের গতিপথে কর্ষিকায় অবস্থিত **গ্লুটিন্যান্ট** জাতীয় নেমাটোসিস্টের গতিপথকে স্পর্শ করে। এ সময় গন্তব্যস্থলের দিকের পেশি-আবরণী কোষের সংকোচন ও অপর পাশের অনুরূপ সম্প্রসারণ ঘটে। পরে পাদ-চাকতি বিযুক্ত করে **কর্ষিকার উপর ভর দিয়ে** দেহকে সোজা করে দেয়। পুনরায় বাঁকিয়ে পাদ-চাকতির সাহায্যে গতিপথকে স্পর্শ করে। পরে কর্ষিকা মুক্ত করে দেহকে সোজা করে দেয়। এ পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে *Hydra* দ্রুত স্থানত্যাগ করে।

চিত্র ২.১.১৫ : সমারসল্টিং চলন

৩. **গ্লাইডিং** (Gliding) বা **অ্যামিবয়** এ প্রক্রিয়ায় *Hydra* পদতলের ব কোষগুলো থেকে পিচ্ছিল রস ক্ষরণ করে স্থান থেকেই প্রক্ষিপ্ত কোষীয় ক্ষণপদের আ চলনের সাহায্যে দেহটি অত্যন্ত ধী মসৃণতলে খুব সামান্য দূরত্বে স্থানান্তরিত হ

৪. **ভাসা** (Floating) : মাঝে মাঝে পাদ-চাকতির বহিঃত্বকীয় কোষ থেকে গ্যাসীয় **বুদবুদ** সৃষ্টি করে, ফলে প্রাণী ভিত্তি থেকে বিচ্যুত, হালকা ও উ পানির পৃষ্ঠতলে ভেসে উঠে। এখানে বুদবুদ ফেটে ভেলার মতো ছড়িয়ে গেলে *Hydra* নিম্নমুখী হয়ে ভেসে থাকে সময় এভাবে প্রাণী ঢেউয়ের আঘাতে কিছুদূর ভেসেও যেতে পারে।

৫. **সাঁতার** (Swimming) : কর্ষিকাগুলোকে ঢেউয়ের মতো আন্দোলিত করে এবং দেহকে ভিত্তি থেকে *Hydra* সহজেই সাঁতার কাটতে পারে।

৬. **হেঁচড়ান** (Crawling) : এ প্রক্রিয়ায় *Hydra* কর্ষিকার সাহায্যে কাছাকাছি কোনো বস্তুকে আঁকড়ে ধ পাদ-চাকতি মুক্ত ও কর্ষিকা সংকুচিত করে পাদ-চাকতিকে নতুন জায়গায় স্থাপন করে। এ প্রক্রিয়ায় *Hydra*-র ও **অবরোহণ** সম্পন্ন হয়।

৭. **হাঁটা** (Walking) : এ ক্ষেত্রে *Hydra* তার দেহের ভার পাদ-চাকতির উপর না রেখে কর্ষিকার উপ করে এবং কর্ষিকাকে পায়ের মতো ব্যবহার করে উল্টাভাবে ধীরে ধীরে চলতে পারে। নতমুখী চলন (Tent

৮. **দেহের সংকোচন-প্রসারণ** (Body contraction and expansion) : এ প্রক্রিয়ায় *Hydra* তার দেহকে মুক্ত করে দেহপ্রাচীরের পেশি-আবরণী টিস্যুর সংকোচন ও প্রসারণের মাধ্যমে দেহের আকার দ্রুত খাটো ও লম্বা করে, ফলে এক ধরনের চলনের সৃষ্টি হয়।

৯. ক্রম সংকোচন : সাপের মত চলন

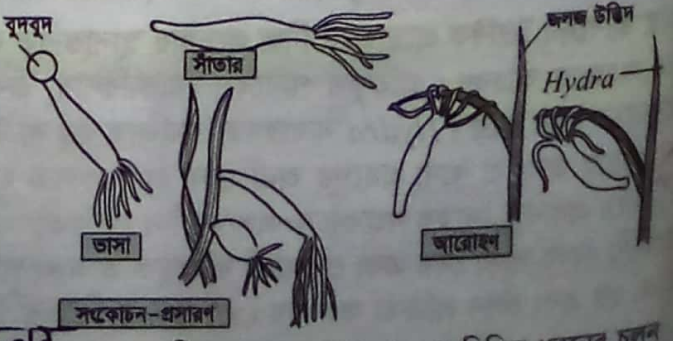

চিত্র ২.১.১৬ : *Hydra*-র বিভিন্ন ধরনের চলন

Hydra-র লুপিং ও সমারসল্টিং চলনের তুলনা

১. **প্রক্রিয়া :** লুপিং প্রক্রিয়ায় *Hydra* কর্ষিকা দিয়ে চলনতল স্পর্শ করে এবং পাদ-চাকতি হিঁচড়ে নেয়। সমারসল্টিংয়ের সময় কর্ষিকা দিয়ে চলনতল স্পর্শ করে এবং পাদ-চাকতি উল্টিয়ে নেয়।

২. **গতির দিক :** লুপিংয়ের সময় দেহের মৌখিক অংশ সবসময় গতিপথের দিকে এবং পাদ-চাকতি পেছনে থাকে। সমারসল্টিংয়ের সময় দেহের মৌখিক অংশ ও পাদ-চাকতি পর্যায়ক্রমে গতিপথের দিকে ও পেছনে থাকে।

৩. **লুপ :** একটি লুপিং চলনে একটি লুপ বা ফাঁস গঠিত হয় কিন্তু সামারসল্টিংয়ের ক্ষেত্রে দুটি লুপ গঠিত হয়।

৪. **অতিক্রান্ত দূরত্ব :** একটি লুপিং-এ দেহের দৈর্ঘ্য অপেক্ষা কম দূরত্ব অতিক্রম করে। একটি সমারসল্টিং-এ দেহের দৈর্ঘ্যের প্রায় দ্বিগুণ দূরত্ব অতিক্রম করে।

৫. **চলনের গতি :** লুপিং পদ্ধতিতে *Hydra* অপেক্ষাকৃত মন্থর গতিতে চলে। সমারসল্টিং পদ্ধতিতে *Hydra* দ্রুত গতিতে চলে।

Hydra-র জনন (Reproduction of *Hydra*)

যে প্রক্রিয়ায় জীব নিজ বংশধর রক্ষার জন্য প্রজননক্ষম অনুরূপ জীব সৃষ্টি করে তাকে **জনন** বলে। এ প্রক্রিয়ায় জীব দেহাংশের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে (অযৌন) বা একই প্রজাতির অন্য সদস্যের সহযোগিতায় ও গ্যামেট সৃষ্টির মাধ্যমে পরোক্ষভাবে (যৌন) নিজ আকৃতিসদৃশ বংশধর সৃষ্টি করে। *Hydra* **অযৌন** ও **যৌন** উভয় প্রক্রিয়ায় বংশ বৃদ্ধি করে।

অযৌন জনন (Asexual reproduction)

গ্যামেট উৎপাদন ছাড়াই যে জনন সম্পাদিত হয় তাকে অযৌন জনন বলে। এ ধরনের জনন পদ্ধতিতে একটি মাত্র জনিতা থেকেই নতুন জীবের সৃষ্টি হয়। *Hydra* দুভাবে অযৌন জনন সম্পন্ন করে, যথা– **মুকুলোদগম** ও **বিভাজন।**

১. মুকুলোদগম (Budding) : এটি অযৌন জননের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। বছরের সব ঋতুতেই বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে পর্যাপ্ত খাদ্য সরবরাহ থাকায় এটি বেশি ঘটে। বেশ কয়েকটি ধাপে প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয়। যেমন–

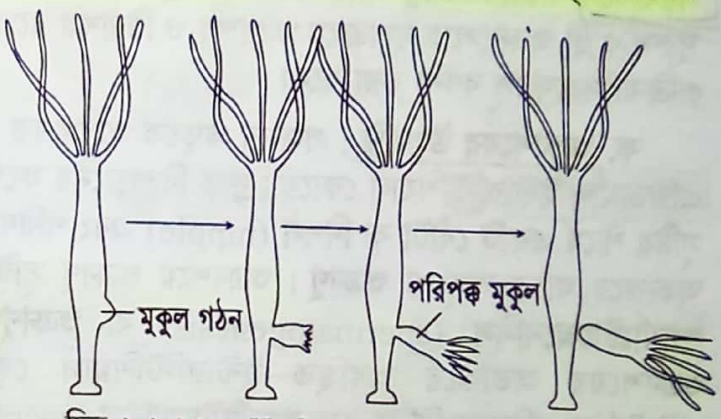

চিত্র ২.১.১৭ : *Hydra*-র মুকুলোদগমের ধাপসমূহ

i. প্রক্রিয়ার শুরুতে দেহের মধ্যাংশ বা নিম্নাংশের কোন স্থানের এপিডার্মিসের ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ দ্রুত বিভাজিত হয়ে একটি ক্ষুদ্র **স্ফীত** অংশের সৃষ্টি করে।

ii. স্ফীত অংশটি ক্রমশ বড় হয়ে ফাঁপা, নলাকার **মুকুল** (bud)-এ পরিণত হয়। এতে এপিডার্মিস, মেসোগ্লিয়া ও গ্যাস্ট্রোডার্মিস সৃষ্টি হয়।

মুকুলোদগম সম্পন্ন হতে ২-৩ দিন সময় লাগে।

iii. মাতৃহাইড্রার সিলেন্টেরন মুকুলের কেন্দ্রে প্রসারিত হয়।

iv. মুকুলটি মাতৃহাইড্রা থেকে পুষ্টি গ্রহণ করে বড় হয় এবং শীর্ষপ্রান্তে গঠিত হয় মুখছিদ্র, হাইপোস্টোম ও কর্ষিকা।

v. এসময় মাতৃহাইড্রা ও মুকুলের সংযোগস্থলে একটি বৃত্তাকার খাঁজের সৃষ্টি হয়। খাঁজটি ক্রমে গভীর হয়ে মুকুল তথা অপত্য হাইড্রাকে মাতৃহাইড্রা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়।

vi. অপত্য হাইড্রার বিচ্ছিন্ন হওয়ার প্রান্তে পাদ-চাকতি গঠিত হয়।

vii. শিশু হাইড্রা কিছুক্ষণ বিচরণের পর নিমজ্জিত কোনো বস্তুর সংলগ্ন হয়ে স্বাধীন জীবন যাপন শুরু করে।

ঘটনাক্রমে একটি *Hydra*-য় বেশ কয়েকটি মুকুলের সৃষ্টি হতে পারে। এসব মুকুল আবার নতুন মুকুল সৃষ্টি করতে পারে। সম্পূর্ণ মাতৃ *Hydra*-কে তখন একটি দলবদ্ধ প্রাণীর মতো দেখায়। মুকল সৃষ্টি এবং মাতৃ *Hydra* থেকে বিচ্যুত হয়ে স্বাধীন জীবন যাপন করতে প্রায় তিন সপ্তাহ সময় লাগে। ২১ দিন

২. বিভাজন (Fission) : বিভাজন কোনো স্বাভাবিক জনন প্রক্রিয়া নয় কারণ এটি দৈবাৎ সংঘটিত হয়। কোন বাহ্যিক কারণে হাইড্রার দেহ দুই বা ততোধিক খণ্ডে বিভক্ত হলে প্রত্যেক খণ্ড থেকে নতুন হাইড্রা জন্মায়। একে **পুনরুৎপত্তি** (regeneration) বলে, কারণ এ প্রক্রিয়ায় হৃত বা বিনষ্ট দেহাংশ পুনর্গঠিত হয়। **ট্রেম্বলে** (Trembley) ১৭৪৪ সালে সর্ব প্রথম *Hydra*-র পুনরুৎপত্তি ক্ষমতার কথা উল্লেখ করেন। এ ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন অংশের ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ তড়িৎগতিতে বিভাজিত ও রূপান্তরিত হয়ে বিভিন্ন কোষ সৃষ্টি করে। এসব কোষ দিয়ে দেহের বিভিন্ন অংশ গঠনের মাধ্যমে অপত্য হাইড্রার বিকাশ ঘটে। সুতরাং হাইড্রার স্বাভাবিক মৃত্যু নেই। বিভাজন দুভাবে হতে পারে, যথা-অনুদৈর্ঘ্য বিভাজন ও অনুপ্রস্থ বিভাজন।

i. **অনুদৈর্ঘ্য বিভাজন :** হাইড্রার দেহ কোনো কারণে লম্বালম্বি দুই বা ততোধিক খন্ডে বিভক্ত হলে প্রত্যে থেকে পৃথক হাইড্রার উৎপত্তি হয়।

ii. **অনুপ্রস্থ বিভাজন :** কোনো কারণে হাইড্রার দেহ অনুপ্রস্থভাবে একাধিক খণ্ডে খণ্ডিত হলে প্রত্যেক পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়ায় নতুন হাইড্রা জন্ম লাভ করে।

যৌন জনন (Sexual reproduction)

নিষেকের মাধ্যমে জাইগোট সৃষ্টির উদ্দেশে দুটি পরিণত জননকোষের (শুক্রাণু ও ডিম্বাণু)একীভবন প্রক্রিয়া জনন বলে।

Hydra-র যৌন জননকে আলোচনার সুবিধার জন্য তিনটি শিরোনামভুক্ত করা যায়, যেমন–**অস্থায়ী জনন নিষেক** ও **পরিস্ফুটন**।

১. অস্থায়ী জননাঙ্গ সৃষ্টি : অধিকাংশ হাইড্রা **একলিঙ্গ** (dioecious), তবে কিছু সংখ্যক **উভলিঙ্গ** (monoও আছে। উভলিঙ্গ হলেও এদের স্বনিষেক ঘটে না, কারণ জননাঙ্গগুলো বিভিন্ন সময়ে পরিপক্কতা লাভ করে। শরৎকালে খাদ্যের অপ্রতুলতার মতো প্রতিকূল পরিবেশে এদের দেহে অস্থায়ী জননাঙ্গের সৃষ্টি হয় এবং যৌন জ পুরুষ ও স্ত্রী জননাঙ্গকে যথাক্রমে **শুক্রাশয়** ও **ডিম্বাশয়** বলে। নিচে জননাঙ্গের উৎপত্তি ও এদের অভ্যন্তরে জননে প্রক্রিয়া সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো।

ক. শুক্রাশয়ের উৎপত্তি : প্রজনন ঋতুতে সাধারণত দেহের উপরের অর্ধাংশে ও হাইপোস্টোমের কাছাকা এপিডার্মাল ইন্টারস্টিশিয়াল কোষের দ্রুত বিভাজনের ফলে এক বা একাধিক মোচাকার **শুক্রাশয়** (testis) সৃষ্টি সৃষ্টির শীর্ষে একটি **বোঁটা** বা **নিপল** (nipple) এবং পরিণত শুক্রাশয়ের অভ্যন্তরে থাকে অসংখ্য **শুক্রাণু**। শুক্রাশয়ে শুক্রাণু সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে **স্পার্মাটোজেনেসিস** (spermatogenesis) বা **শুক্রাণুজনন** বলে। শুক্রাশয়ের অভ্যন্তরে অবস্থিত ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ বারবার মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বিভক্ত হয়ে **স্পার্মাটোগোনিয়া** (spermatogonia) সৃষ্টি করে। পরে এগুলো বৃদ্ধিলাভ করে **স্পার্মাটোসাইট** (spermatocyte)-এ পরিণত হয়। প্রত্যেক স্পার্মাটোসাইট মিয়োসিস বিভাজনের ফলে ৪টি করে হ্যাপ্লয়েড **স্পার্মাটিড** (spermatid) উৎপন্ন করে। প্রতিটি স্পার্মাটিড একেকটি **শুক্রাণু** (sperm)–তে পরিণত হয়। প্রত্যেক পরিণত শুক্রাণু নিউক্লিয়াসযুক্ত একটি স্ফীত মস্তক (head), সেন্ট্রিওলযুক্ত একটি সংকীর্ণ মধ্যখন্ড (middle piece) এবং একটি লম্বা, সরু, বিচলনক্ষম লেজ (tail) নিয়ে গঠিত।

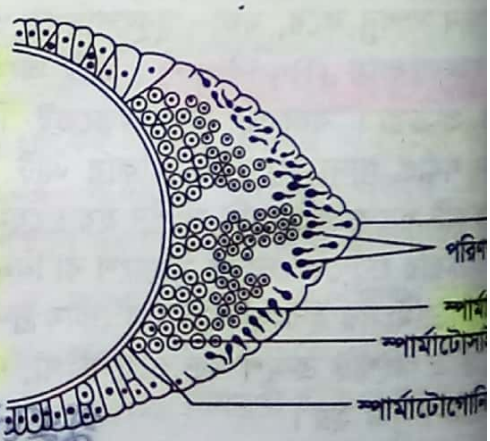

চিত্র ২.১.১৮ : শুক্রাশয়ের প্রস্থচ্ছেদ

খ. ডিম্বাশয়ের উৎপত্তি : প্রজনন ঋতুতে দেহের নিচের অর্ধাংশে, কিন্তু পদতলের সামান্য উপরে এপি একটি বা দুটি স্থানের কিছু ইন্টারস্টিশিয়াল কোষের বারংবার বিভাজনের ফলে সাধারণত একটি বা দুটি গো **ডিম্বাশয়** (ovary) সৃষ্টি করে। প্রত্যেক ডিম্বাশয় থেকে একটি ক (ova) সৃষ্টি হয়। যে প্রক্রিয়ায় ডিম্বাশয়ের অভ্যন্তরে ডিম্বাণু তাকে **উওজেনেসিস** (oogenesis) বা **ডিম্বাণুজনন** বলে। ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয়ে **উও** (oogonia) গঠন করে। এদের ভেতর কেন্দ্রস্থ একটি কোষ **উওসাইট** (oocyte)-এ পরিণত হয় এবং ছোট কোষগু গলাধঃকরণ করে। এটি তখন মিয়োসিস বিভাজন ঘটিয়ে এ **পোলার বডি** (polar body) ও ১টি বড় সক্রিয় **উওটিড** (ooti করে। উওটিডটি রূপান্তরিত হয়ে ডিম্বাণুতে পরিণত হয়। বডিগুলো বিলুপ্ত হয়ে যায়। ডিম্বাণুর পরিপূর্ণ বৃদ্ধির ফলে ডি বহিরাবরণ ছিঁড়ে যায় এবং ডিম্বাণুকে উন্মুক্ত করে দেয়। এর তখন জিলেটিনের পিচ্ছিল আস্তরণ থাকে।

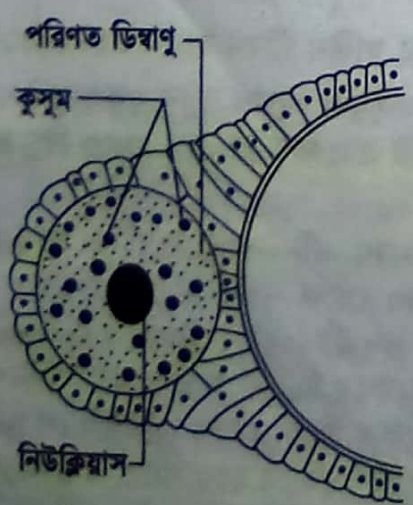

চিত্র ২.১.১৯ : ডিম্বাশয়ের প্রস্থচ্ছেদ

২. নিষেক (Fertilization) : শুক্রাণু পরিণত হলে শুক্রাশয়ের নিপল বিদীর্ণ করে ডিম্বাণুর সন্ধানে পানিতে ঝাঁকে ঝাঁকে সাঁতরাতে থাকে। ২৪-৪৮ ঘন্টার মধ্যে ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করতে না পারলে এগুলো বিনষ্ট হয়ে যায়। অন্যদিকে, উন্মুক্ত হওয়ার পর অল্পদিনের মধ্যে নিষিক্ত না হলে ডিম্বাণুও নষ্ট হয়ে ক্রমশ ধ্বংস হতে থাকে। শুক্রাণুর ঝাঁক একেকটি ডিম্বাণুর চারদিক ঘিরে ফেলে। একাধিক শুক্রাণু ডিম্বাণুর আবরণ ভেদ করলেও একটিমাত্র শুক্রাণুর নিউক্লিয়াসই ডিম্বাণুর নিউক্লিয়াসের সাথে একীভূত হয়ে **নিষেক** সম্পন্ন করে এবং একটি ডিপ্লয়েড (2n) **জাইগোট** (zygote) গঠন করে।

৩. পরিস্ফুটন (Development) : যেসব ক্রমান্বয়িক পরিবর্তনের মাধ্যমে জাইগোট থেকে শিশু প্রাণীর উৎপত্তি ঘটে তাকে **পরিস্ফুটন** বলে। জাইগোট নানা ধরনের পরিস্ফুটন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ হাইড্রায় পরিণত হয়।

হাইড্রার পরিস্ফুটনকালে নিম্নোক্ত পর্যায়সমূহ দেখা যায়।

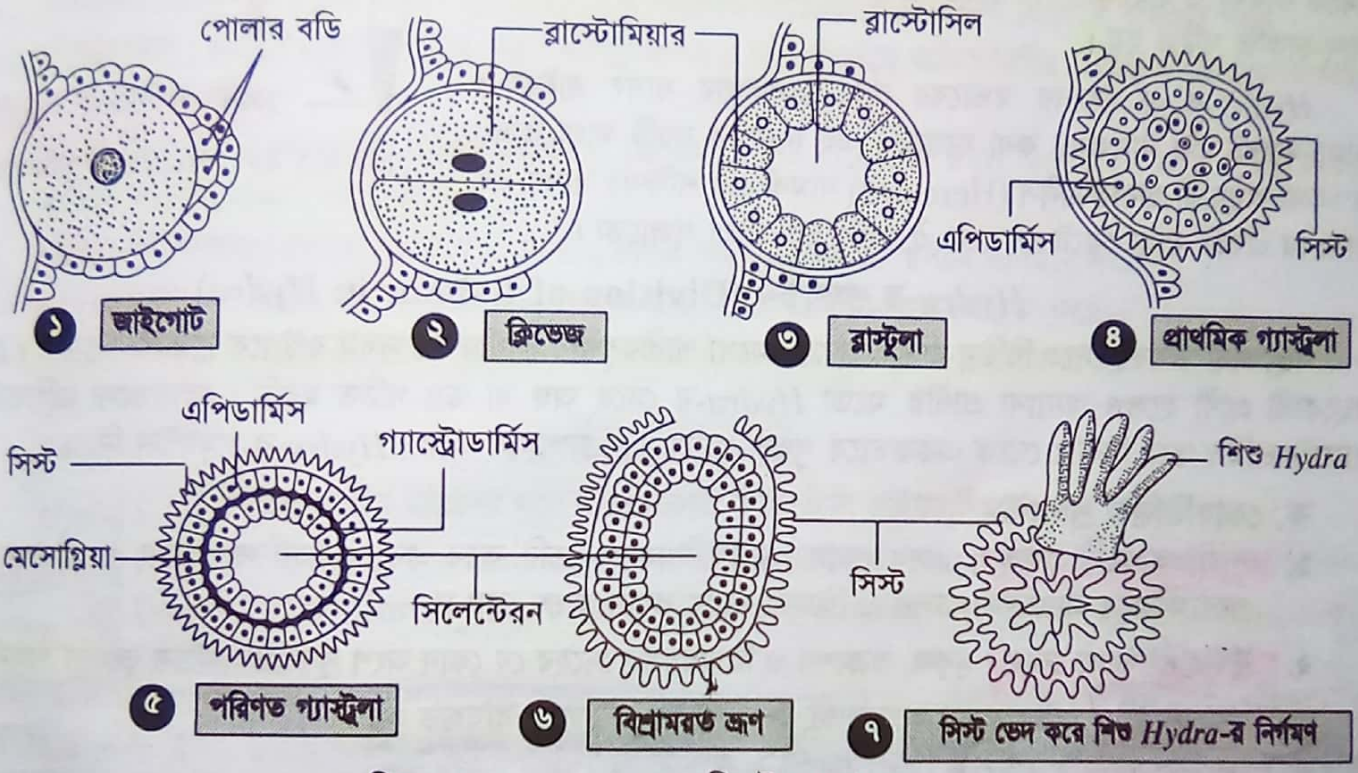

চিত্র ২.১.২০ : *Hydra*-র পরিস্ফুটনের ধাপসমূহ

ক. মরুলা (Morula) : জাইগোট মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বারবার বিভাজিত হয়ে বহুকোষী, নিরেট ও গোলা কোষপিণ্ডে পরিণত হয়। একে **মরুলা** বলে।

খ. ব্লাস্টুলা (Blastula) : শীঘ্রই মরুলার কোষগুলো একস্তরে সজ্জিত হয়ে একটি ফাঁপা, গোলাকার ভ্রূণে পরিণত হয়। এর নাম ব্লাস্টুলা। ব্লাস্টুলার কোষগুলোকে **ব্লাস্টোমিয়ার** (blastomere) এবং কেন্দ্রে ফাঁকা গহ্বরকে **ব্লাস্টোসিল** (blastocoel) বলে। আবরণকে ব্লাস্টোডার্ম বলে। কোষ গুলোর মধ্যবর্তী ছিদ্রকে ব্লাস্টোপোর বলে।

গ. গ্যাস্ট্রুলা (Gastrula) : ব্লাস্টুলা **গ্যাস্ট্রুলেশন** (gastrulation) পদ্ধতিতে দ্বিস্তরবিশিষ্ট গ্যাস্ট্রুলায় পরিণত হয়। এটি এক্টোডার্ম, এন্ডোডার্ম ও আদি সিলেন্টেরন নিয়ে গঠিত। মাতৃদেহের সাথে সংযুক্ত এ গ্যাস্ট্রুলাকে **স্টেরিওগ্যাস্ট্রুলা** (stereogastrula) বলে। গ্যাস্ট্রুলার চারদিকে একটি কাইটিননির্মিত কাঁটাযুক্ত **সিস্ট** (cyst) আবরণী গঠিত হয়। সিস্টবদ্ধ ভ্রূণটি মাতৃহাইড্রা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জলাশয়ের তলদেশে চলে যায়।

ঘ. হাইড্রুলা (Hydrula) : বসন্তের শুরুতে অনুকূল তাপমাত্রায় সিস্টের মধ্যেই ভ্রূণটি ক্রমশ লম্বা হতে থাকে এবং এর অগ্রপ্রান্তে হাইপোস্টোম, মুখছিদ্র ও কর্ষিকা এবং পশ্চাৎপ্রান্তে পাদ-চাকতি গঠিত হয়। ভ্রূণের এই দশাকে হাইড্রুলা বলে। হাইড্রুলা সিস্টের আবরণী বিদীর্ণ করে পানিতে বের হয়ে আসে এবং স্বাধীন জীবন যাপন শুরু করে।

এপিডার্মিস ও গ্যাস্ট্রোডার্মিস অক্ষুন্ন থাকলে সর্বনিম্ন 0.004 mm ব্যাসের টুকরা থেকে হাইড্রার উৎপত্তি ঘটে।

Hydra-র পুনরুপত্তি (Regeneration)

যে প্রক্রিয়ায় কোনো প্রাণীর হারানো বা নষ্ট হয়ে যাওয়া দেহাংশকে দেহে পুনর্গঠন করে তাকে **পুনরুৎপত্তি** (regeneration) বলে। হাইড্রার ব্যাপক পুনরুৎপত্তি ক্ষমতা রয়েছে। **আব্রাহাম ট্রেমলে** (Abraham Trembley, 1744) প্রথম হাইড্রার পুনরুৎপত্তি ক্ষমতা পর্যবেক্ষণ করেন। কোনো হাইড্রাকে যদি কয়েক খণ্ডে বিভক্ত করা হয় তাহলে প্রতিটি খণ্ডই এর হারানো অংশকে পুনরুৎপাদন করে নতুন হাইড্রা সৃষ্টি করে। প্রতিটি অংশই তার মূল মেরুতা বজায় রাখে অর্থাৎ **মৌখিক প্রান্ত** (oral end) থেকে কর্ষিকা ও হাইপোস্টোম এবং **বিমৌখিক প্রান্ত** (aboral end) থেকে পাদ-চাকতি গঠিত হয়।

চিত্র ২.১.২১ : *Hydra*-র পুনরুৎ

Hydra-র এ ধরনের স্বভাবের জন্য রূপকথার দানব **হাইড্রা**-র নামানুসারেই এর নামকরণ করা হয়েছে। এই দানবের নয়টি মাথা ছিল। রূপকথা অনুযায়ী **হারকিউলিস** (Hercules) নামক এক শক্তিধর মানব এই দানবের একটি মাথা কেটে ফেললে ঐ স্থানে দুটি মাথা গজাতো।

Hydra-য় শ্রমবন্টন (Division of Labour in *Hydra*)

বহুকোষী জীবের দেহে বিভিন্ন অঙ্গ বা তন্ত্রের মধ্যে শারীরবৃত্তীয় কার্যাবলীর সুষম বণ্টনকে **শ্রমবন্টন** বুঝায়। বহুকোষী প্রাণী হলেও অন্যান্য প্রাণীর মতো *Hydra*-র দেহে অঙ্গ বা তন্ত্র গঠিত হয়নি। কোষগুলো এপিডা গ্যাস্ট্রোডার্মিস স্তরে বিন্যস্ত থেকে এককভাবে পৃথক পৃথক কার্য সম্পাদন করে। *Hydra*-র শ্রমবণ্টন নিম্নরূপ:

ক. কোষভিত্তিক শ্রমবন্টন

১. **পেশি-আবরণী কোষ :** এসব কোষ দেহের আবরণ তৈরি করে এবং দেহের সংকোচন ও প্রসারণ পরোক্ষভাবে আত্মরক্ষা, চলন ও শিকার ধরার কাজে অংশ নেয়।

২. **ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ :** মুকুল, শুক্রাশয় ও ডিম্বাশয়সহ দেহের যে কোন অংশ পুনর্গঠনে সক্রিয় ভূমিকা পালন

৩. **নিডোসাইট :** এসব কোষ আত্মরক্ষা, শিকার ধরা ও চলনে ব্যবহৃত হয়।

৪. **সংবেদী কোষ :** পরিবেশ থেকে বিভিন্ন উদ্দীপনা গ্রহণ করা এদের কাজ।

৫. **স্নায়ু কোষ :** সংবেদী কোষ কর্তৃক গৃহীত উদ্দীপনা অনুযায়ী উপযুক্ত প্রতিবেদন সৃষ্টি করে এবং সকল কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে।

৬. **গ্রন্থিকোষ :** গ্যাস্ট্রোডার্মিসের গ্রন্থিকোষ মিউকাস ও বিভিন্ন প্রকার এনজাইম নিঃসরণ করে পরিপাকে সা করে। পাদ-চাকতিতে উপস্থিত গ্রন্থিকোষ থেকে নিঃসৃত আঠালো রস হাড্রাকে কোন বস্তুর সাথে থাকতে সহায়তা করে এবং বুদবুদ গঠনের মাধ্যমে ভেসে চলতে সাহায্য করে।

৭. **নিউট্রিটিভ-মাসকুলার কোষ বা পুষ্টি-পেশিকোষ :** বহিঃকোষীয় ও অন্তঃকোষীয় পরিপাক সম্পন্ন করে।

খ. কার্যভিত্তিক শ্রমবন্টন : *Hydra*-র দেহে উপস্থিত বিভিন্ন অংশগুলোর বিভিন্ন কাজে অংশ নেয়, যেমন-

১. **মুখছিদ্র :** খাদ্য গ্রহণ ও বিভিন্ন বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশনে সহায়তা করে।

২. **সিলেন্টেরন :** পরিপাক ও পরিবহন গহ্বর হিসেবে শারীরবৃত্তীয় কাজ সম্পাদন করে।

৩. **কর্ষিকাসমূহ :** আত্মরক্ষা, শিকার ধরা, চলন প্রভৃতি কাজে ব্যবহৃত হয়।

৪. **পাদ-চাকতি :** কোন বস্তুর সাথে আটকে থাকতে এবং চলনে সহায়তা করে।

৫. **দেহকাণ্ড :** জনন অঙ্গ এবং মুকুল ধারণ করে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, *Hydra*-র দেহে উপস্থিত বিভিন্ন ধরনের কোষ এককভাবে যাবতীয় শারীরবৃত্তীয় কা সম্পন্ন করে। অর্থাৎ বলা যায় *Hydra*-য় শ্রমবন্টন উল্লেখযোগ্য। প্রাণিরাজ্যে *Hydra* তথা Cnidaria পর্বের সর্বপ্রথম কোষের গঠনমূলক বৈষম্য ও শ্রমবন্টন দেখা যায়।

মিথোজীবিতা (Symbiosis; গ্রিক. *symbioum* = live together)

যখন দুটি ভিন্ন প্রজাতিভুক্ত জীব ঘনিষ্ঠভাবে সহাবস্থানের ফলে পরস্পরের কাছ থেকে উপকৃত হয়, তখন এ ধরনের সাহচর্যকে মিথোজীবিতা বলে। এ অবস্থায় জীবদুটিকে মিথোজীবী (symbiont) বলা হয়। *Hydra viridissima* (=*Chlorohydra viridissima*) নামক সবুজ হাইড্রা ও *Zoochlorella* নামক শৈবাল এর মধ্যে এ সম্পর্ক সুস্পষ্ট প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। *Zoochlorella* বা সবুজ শৈবাল হাইড্রার গ্যাস্ট্রোডার্মিসে বাস করে। হাইড্রা অর্ধঃস্বচ্ছ প্রাণী হওয়ায় এ শৈবালের অন্তঃস্থ উপস্থিতি *Chlorohydra* কে সবুজ বর্ণ প্রদান করে এবং এজন্য হাইড্রাটিও বাইরে থেকে সবুজ দেখায়। নিম্নোক্তভাবে এরা পরস্পরের কাছ থেকে উপকৃত হয়।

শৈবালের প্রাপ্ত উপকার

i. **আশ্রয় :** শৈবাল হাইড্রার গ্যাস্ট্রোডার্মাল (অন্তঃকোষীয়) পেশি-আবরণী কোষে আশ্রয় পায়;
ii. **সালোকসংশ্লেষণ :** হাইড্রার শ্বসনে সৃষ্ট CO_2-কে সালোকসংশ্লেষণের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করে;
iii. **খাদ্যোৎপাদন :** হাইড্রার বিপাকীয় কাজে উদ্ভূত নাইট্রোজেনজাত বর্জ্য পদার্থকে আমিষ তৈরির বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করে।

***Hydra*-র প্রাপ্ত উপকার**

i. **খাদ্যপ্রাপ্তি :** সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় শৈবাল যে খাদ্য প্রস্তুত করে তার উদ্বৃত্ত অংশ গ্রহণ করে হাইড্রা শর্করা জাতীয় খাদ্যের অভাব পূরণ করে;
ii. **শ্বসন :** সালোকসংশ্লেষণকালে শৈবাল যে O_2 নির্গত করে হাইড্রা তা শ্বসনে ব্যবহার করে;
iii. **CO_2 শোষণ :** হাইড্রার শ্বসনে সৃষ্ট CO_2 শৈবাল গ্রহণ করে প্রাণীকে ঝামেলামুক্ত করে;
iv. **বর্জ্য নিষ্কাশন :** হাইড্রার বিপাকে সৃষ্ট N_2-ঘটিত বর্জ্য শৈবাল কর্তৃক গৃহীত হওয়ায় হাইড্রা সহজেই বর্জ্যপদার্থ মুক্ত হয়।

ব্যবহারিক অংশ

১. ***Hydr***

প্রয়োজনীয় অণুবীক্ষণযন্ত্র, চি

(i). **লিগিউম** জাতীয় উদ্ভিদের মূলে বসবাসকারী মিথোজীবী **রাইজোবিয়াম** ব্যাকটেরিয়া
(ii). **তাপসী কাঁকড়া** (hermit crab) **ও সী অ্যানিমোনের** (sea anemone) মধ্যে মিথোজীবিতা ইত্যাদি
(iii). হাইড্রা, Chlorohydra viridissima এবং এককোষী সবুজ শৈবাল, Zoochlorella-**এর মধ্যে স্থাপিত মিথোজীবিতা।**

কার্যপদ্ধতি : শিক্ষার্থী গবেষণাগারে অণুবীক্ষণযন্ত্রের সাহায্যে *Hydra*-র স্থায়ী স্লাইড অথবা শিক্ষক প্রদত্ত *Hydra*-র মডেল পর্যবেক্ষণ করে, একে শনাক্ত করবে, এর শ্রেণিবিন্যাস জানবে, ড্রইং শীটে এর চিহ্নিত চিত্র আঁকবে ও শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্যসমূহ লিখবে।

শনাক্তকরণ

১. দেহটি নলাকার; একপ্রান্ত খোলা ও অন্যপ্রান্ত বদ্ধ।
২. মুক্ত প্রান্তে অবস্থিত মোচাকৃতি হাইপোস্টোমের চূড়ায় **মুখছিদ্র** অবস্থিত।
৩. হাইপোস্টোমকে ঘিরে কয়েকটি সুতার মতো **কর্ষিকা** রয়েছে।
৪. দেহের বদ্ধ (নিম্ন) প্রান্তে গোলাকার **পাদ-চাকতি** অবস্থিত।
৫. দেহে **মুকুল** দেখা যায়।

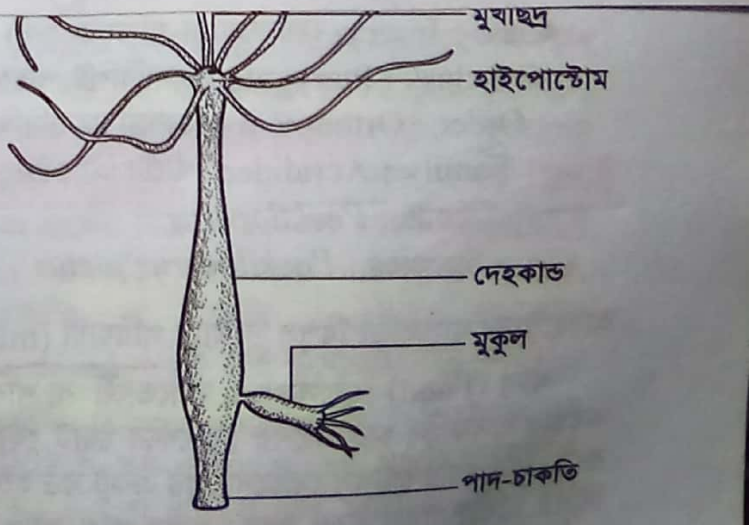

চিত্র ২.১.২২ : *Hydra* -র পূর্ণমাউন্ট

[গবেষণাগারে পরীক্ষার জন্য *Hydra* সংগ্রহ : গবেষণাগারে পরীক্ষার জন্য খুব সহজেই *Hydra* সংগ্রহ করা যায়। শীতের শুরুতে যখন পুকুর, ডোবা, হ্রদ বা খালের পানি কমতে শুরু করে তখন এসব জলাশয়ের মাত্র ৩০ সেন্টিমিটার গভীর থেকে কিছু ডালপালা বা জলজ উদ্ভিদ কিংবা অন্য কোনো জলজ বস্তু তুলে আনতে হবে। যেহেতু *Hydra* সাধারণত কোনো বস্তুর সাথে আটকানো থাকে তাই পানি থেকে শুধু *Hydra* তুলে আনা সম্ভব নয়। জলাশয় থেকে সংগৃহিত এসব বস্তু পানিপূর্ণ একটি কাঁচের জার (Jar)-এ রেখে সেটি কিছুক্ষণের জন্য আলোকিত স্থানে রাখতে হবে। কিছুক্ষণ পর দেখা যাবে *Hydra* গুলো (যদি সংগৃহীত বস্তুগুলোতে থেকে থাকে) জারের তলদেশ বা পার্শ্বপ্রাচীরে এসে আশ্রয় নিয়েছে। তখন পিপেট (pipette)-এর সাহায্যে এদেরকে পেট্রিডিস বা স্লাইডে উঠিয়ে অণুবীক্ষণযন্ত্রের নিচে নিরীক্ষণ করা হয়।]

২.২ প্রতীক প্রাণী : ঘাসফড়িং (The Grasshopper, *Poekilocerus pictus*)

আরশোলার মতো ঘাসফড়িংও একটি অতিপরিচিত **পতঙ্গ** (insect)। বাংলাদেশসহ পৃথিবীর সবখানে শস্যক্ষেত বা সবজির বাগানে বিভিন্ন ধরনের ঘাসফড়িং একা বা দলবদ্ধ হয়ে বিচরণ করে। ঘাসফড়িং-এর কিছু প্রজ **পঙ্গপাল** (locust) নামে পরিচিত। এগুলো বাদামি বর্ণের মাঝারি আকৃতির পতঙ্গ এবং ঝাঁক বেঁধে এক এলাকা অন্য এলাকায় ঘুরে বেড়ায়। কখনও কখনও এদের সংখ্যা এত বেড়ে যায় যে মুহূর্তের মধ্যে একটি ক্ষেতের সমস্ত খেয়ে সাবাড় করে ফেলতে পারে। পঙ্গপাল গ্রীষ্মমণ্ডলীয় দেশের শস্যক্ষেতের জন্য মারাত্মক হুমকি।

ঘাসফড়িং যেহেতু একটি করে কাইটিনময় **বহিঃকঙ্কাল,** একটি তিনখণ্ডবিশিষ্ট **দেহ** (মস্তক, বক্ষ ও উদর), **তিনজো সন্ধিযুক্ত পা**, জটিল **পুঞ্জাক্ষি** এবং একজোড়া **অ্যান্টেনা** বহন করে সে কারণে এদের **Insecta** শ্রেণিভুক্ত সদস্য বা নামে অভিহিত করা হয়। ঘাস ও লতাপাতার মধ্যে থেকে সেখানেই লাফিয়ে লাফিয়ে চলে, তাই এর নাম হ "ঘাসফড়িং"। ঘাসফড়িং দুধরনের, যথা–লম্বা অ্যান্টিনাযুক্ত ঘাসফড়িং-এরা Tettinonidae গোত্রের এবং অ্যান্টিনাযুক্ত ঘাসফড়িং *Acrididae* গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। *Poekilocerus pictus* আমাদের দেশের খাটো অ্যান্টি ঘাসফড়িংয়ের অন্যতম।

পৃথিবীতে প্রায় বিশ হাজার প্রজাতির ঘাসফড়িং শনাক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশে এ পর্যন্ত যে **বিশ প্রজা** ঘাসফড়িংয়ের সন্ধান পাওয়া গেছে সেগুলো হচ্ছে– *Acrida exaltata, Phlaeoba infumata, Choroedo robustus, Xenocatantops humilis, Chondracris rosea, Cyrtacanthacris tatarica, Eyprepocne rosea, Aulacobothrus luteipes, Hieroglyphus banian, Gastrimargus marmoratus, Oedal abruptus, Sphingonotus longipennis, Trilophidia annulata, Gesonula punctifrons, Oxya fuscovitt Spathosternum prasiniferum, Atractomorpha crenulata, Chrotogonus trachypterus,* এবং *Poekiloce pictus.*

Reference : Srinivasan, G. and Prabakar, D. 2013
A Pictorial Handbook on Grasshoppers of Western Himalayas.

শ্রেণিতাত্ত্বিক অবস্থান

Phylum : Arthropoda (সন্ধিপদী, কাইটিননির্মিত বহি:কঙ্কাল)
Class : Insecta (তিনজোড়া সন্ধিযুক্ত পদ)
Subclass : Pterygota (ডানাবিশিষ্ট পতঙ্গ)
Order : Orthoptera (দুজোড়া ডানাবিশিষ্ট)
Family : Acrididae (খাটো অ্যান্টেনা)
Genus : *Poekilocerus*
Species : *Poekilocerus pictus*

বাসস্থান (Habitat) : ঘাসফড়িং যেহেতু ঘ পাতা, শস্য ও শস্যের কচিপাতা আহার করে কারণে এমন ধরনের নিচু বসতি এদের পছ মূলত সব ধরনের আবাসেই (তৃণভূমি, বারি চারণভূমি, মাঠ, মরুভূমি, জলাভূমি প্রভৃতি) বি প্রজাতির ঘাসফড়িং দেখা যায়। স্বাদুপানির ম্যানগ্রোভ জলাশয়ে যেহেতু পানির উঠানামা বেশি এবং ডিম পাড়ার জায়গা প্লাবিত হয়ে যায় সে কা এসব বসতিতে ঘাসফড়িং কম বাস করে। প্রতি আবহাওয়ায় ঘাসফড়িং বিপুল সংখ্যায় পরিযায়ী (migratory) হয়, তখন দিনে প্রায় ১৫ কিলোমিটার পর্যন্ত যেতে পা

খাদ্য (Food) : ঘাসফড়িং **তৃণভোজী** বা **শাকাশী** (herbivorous) প্রাণী। ডিম থেকে ফোটার পরপরই, নি অবস্থায় ঘাসফড়িং চার পাশের যে কোন ছোট ছোট, সহজপাচ্য গাছ, ঘাস বা নতুন কোমল শাখা-প্রশাখা খেতে শু করে। দু'একবার খোলস মোচনের পর একটু বড় হলে শক্ত উদ্ভিজ খাবার গ্রহণ করে। তরুণ ঘাসফড়িং পূর্ণাঙ্গদের মতো নির্দিষ্ট উদ্ভিজ খাবার গ্রহণ করে। তখন খাদ্য তালিকায় ঘাস, পাতা ও শস্য প্রধান খাবার হিসেবে উঠে আসে। বেশি ভাগ ঘাসফড়িং অনেক প্রজাতির উদ্ভিদ থেকে আহার সংগ্রহ করে, দু'একটি প্রজাতি সুনির্দিষ্ট উদ্ভিদ থেকে আহার গ্র করে।

বাহ্যিক অঙ্গসংস্থান (External Morphology)

ঘাসফড়িং-এর দেহ সরু, লম্বাটে, বেলনাকার (cylindrical) এবং দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসম। পূর্ণাঙ্গ প্রাণী লম্বায় সেন্টিমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। দেহের রঙ অনেকটা হলদে-সবুজ (yellowish green) ধরনের অথবা বাদামি রঙে মাঝে নানা ধরনের ফোঁটা (spots) বা ডোরাকাটা (markings) হতে পারে। মিশ্রিত এ রঙ তাদের পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে চলা এমনকি শত্রুর হাত থেকেও রক্ষা করতে সাহায্য করে। এছাড়াও কিছু ঘাসফড়িং আছে উজ্জ্বল নীল-হলুদ রঙের (যেমন-*Poekilocercus pictus*)।

ঘাসফড়িং-এর সারাদেহ কাইটিনযুক্ত **কিউটিকল** (cuticle)-এ আবৃত। বহিঃকঙ্কাল **হাইপোডার্মিস** (hypodermis) নিঃসৃত পদার্থে সৃষ্ট এবং প্রত্যেক দেহখন্ডকে **স্ক্লেরাইট** (sclerite) নামক কঠিন প্লেটের মতো গঠন সৃষ্টি করে। স্ক্লেরাইটগুলোর সংযোগস্থল **সূচার** (suture) নামে পাতলা নরম ঝিল্লিতে আবৃত। সূচারের উপস্থিতির কারণে দেহখণ্ডক ও উপাঙ্গগুলো সহজেই নড়াচড়া করতে পারে। কিউটিকলের ভিতরে ও নিচে নানা ধরনের রঞ্জক পদার্থ (pigments) থাকায় ঘাসফড়িং-এর বর্ণময়তা দেখা যায়।

ঘাসফড়িং-এর দেহ খণ্ডকায়িত এবং অন্যসব পতঙ্গের মতো তিনটি অঞ্চলে বিভক্ত, যেমন–

ক. **মস্তক** (Head)–চক্ষু, অ্যান্টেনা এবং মুখোপাঙ্গ বহন করে।

খ. **বক্ষ** (Thorax)–তিনজোড়া পা ও দুজোড়া ডানার সংযোগ সাধন করে এবং বহন করে।

গ. **উদর** (Abdomen)-শ্বাসরন্ধ্র বা **স্পাইরাকল** (spiracle) এবং জনন অঙ্গসমূহ (genitaliae) ধারণ করে।

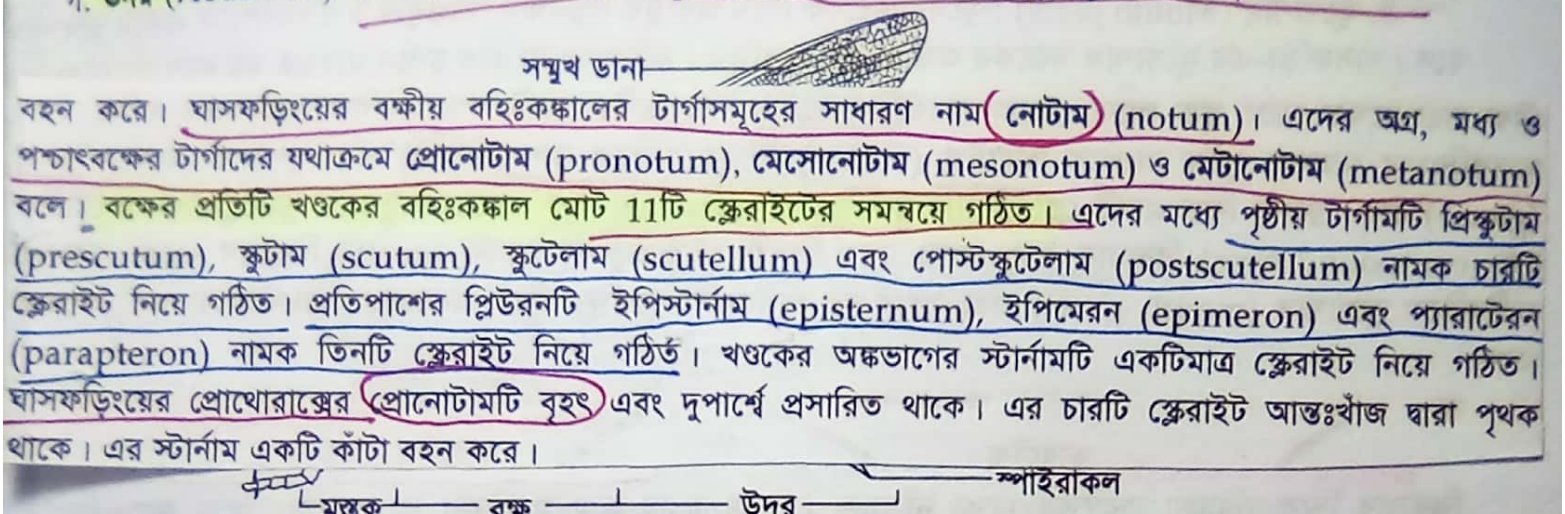

চিত্র ২.২.১ : ঘাসফড়িং-এর বাহ্যিক গঠন (পার্শ্বদৃশ্য)

ক. মস্তক (Head)

বাইরে থেকে অখণ্ডকিত (একক) মনে হলেও মূলত ৬টি ভ্রূণীয় খণ্ডকের (embryonic segments) সমন্বয়ে এটি গঠিত। মস্তক দেখতে নাশপাতি আকৃতির এবং হাইপোগন্যাথাস (hypognathous) ধরনের অর্থাৎ মুখছিদ্র নিম্নমুখী হয়ে মস্তকের নিচে অবস্থান করে। মস্তক একটি ছোট ও স্থিতিস্থাপক গ্রীবার সাহায্যে বক্ষলগ্ন হয়ে দেহের সমকোণে অবস্থান করে। ঘাসফড়িং গ্রীবার মাধ্যমে মস্তককে বিভিন্ন দিকে ঘোরাতে পারে। মস্তকের বহিঃকঙ্কালের নাম **হেড ক্যাপস্যুল** (head capsule) বা **এপিক্রেনিয়াম** (epicranium)। মস্তকের বহিঃকঙ্কাল কয়েকটি অংশে বিভক্ত, যেমন– পৃষ্ঠদেশের ত্রিকোণাকার অঞ্চলটি **ভার্টেক্স** (vertex), দুপাশে অবস্থিত **জেনা** (gena), কপালের দিকে চওড়া **ফ্রন্স** (frons) এবং ফ্রন্সের নিচে আয়তাকার প্লেটটি **ক্লাইপিয়াস** (clypeus)। ঘাসফড়িং-এর মস্তক একজোড়া **পুঞ্জাক্ষি**, তিনটি সরলাক্ষি বা **ওসেলি** (ocilli), একজোড়া **অ্যান্টেনা** (antenna) ও এক সেট **মুখোপাঙ্গ** বহন করে।

চিত্র ২.২.২ : ঘাসফড়িং-এর মস্তক; a. পার্শ্বদৃশ্য এবং b. সম্মুখদৃশ্য

১. পুঞ্জাক্ষি (Compound eye) : ঘাসফড়িং-এর মস্তকের উভয়দিকে পৃষ্ঠ-পার্শ্বদেশে, ১ম খণ্ডকে একজোড়া পুঞ্জাক্ষি থাকে। এগুলো অবৃন্তক এবং মস্তকের এক বিরাট অংশ দখল করে থাকে। দৃষ্টিশক্তির দিক থেকে ঘাসফড়িং যে কোনো আর্থোপোড (Arthropod) অপেক্ষা উন্নত। সম্ভবত এরা রঙিন বস্তুও সঠিকভাবে দেখতে পায়। গঠনগত ও কার্যকারিতার দিক থেকে ঘাসফড়িং-এর পুঞ্জাক্ষি আরশোলা, চিংড়ি প্রভৃতি আর্থোপোড প্রাণীর মতো। অসংখ্য **ওমাটিডিয়া** (ommatidia)-র সমন্বয়ে একেকটি পুঞ্জাক্ষি গঠিত হয়। ওমাটিডিয়াই পুঞ্জাক্ষির গঠন ও কাজের একক।

২. ওসেলি (Ocelli; একবচনে-ocellus) : ঘাসফড়িং-এর দুটি পুঞ্জাক্ষির মাঝখানে তিনটি সরলাক্ষি বা ও থাকে। প্রত্যেক ওসেলাস পুরু, স্বচ্ছ কিউটিকল নির্মিত লেন্স ও একগুচ্ছ আলোক সংবেদী কোষ নিয়ে গঠিত। কোষ রঞ্জক পদার্থসমৃদ্ধ। ওসেলাসের তলদেশে মস্তিষ্কে গমনকারী **স্নায়ুতন্তু** (nerve fibre) অবস্থিত। এর আলোক সংবেদী কোষ থাকে যারা রেটিনার মতো কাজ করে।

৩. অ্যান্টেনা (Antenna; বহুবচনে-antennae) বা **শুঙ্গ** : ঘাসফড়িং-এর পুঞ্জাক্ষির সামনে, মাথার দুপাশে দু অ্যান্টেনি প্রসারিত থাকে। অ্যান্টেনি দুটি সামনে রেখে চলাফেরা করে এবং ইচ্ছামোতো এগুলোকে নাড়াতে পারে। নাড়িয়ে এরা স্পর্শ, ঘ্রাণ ও শব্দতরঙ্গ অনুভব করে। **স্কেপ, পেডিসেল** ও **ফ্লাজেলাম**-এ তিনটি অংশ নিয়ে প্রত্যেক অ গঠিত। পেডিসেল খাটো ও অবিভক্ত। ফ্লাজেলাম বেশ লম্বা ও প্রায় ২৫টি খণ্ডকে বিভক্ত।

৪. মুখোপাঙ্গ (Mouth parts) : মুখের চারদিক ঘিরে অবস্থিত নড়নক্ষম, সন্ধিযুক্ত উপাঙ্গগুলোকে একত্রে মুখে বলে। ঘাসফড়িং-এর মুখোপাঙ্গ মস্তকের অঙ্কীয়দেশে অবস্থিত। কচিপাতা বা কাণ্ড চর্বনে ব্যবহৃত হয় বলে ঘাসফড়ি মুখোপাঙ্গকে **চর্বন-উপযোগী** (chewing) বা **ম্যান্ডিবুলেট** (mandibulate) মুখোপাঙ্গ বলে। পাঁচটি অংশের স মুখোপাঙ্গ গঠিত- ল্যাব্রাম, ম্যান্ডিবল, ম্যাক্সিলা, ল্যাবিয়াম ও হাইপোফ্যারিংক্স।

ঘাসফড়িং-এর মুখোপাঙ্গের বিভিন্ন অংশ

❐ **ল্যাব্রাম** (Labrum) : এটি দেখতে অনেকটা চাপা চাকতির মতো এবং উপরের **ওষ্ঠ** (lip) গঠন করে সবুজ, বাদামি বা অন্য ধরনের হতে পারে। এর মাঝ বরাবর অংশে একটি খাঁজ দেখা যায়। খাঁজটি খাবার ধরে র ম্যান্ডিবলের দিকে ঠেলে দিতে ও স্বাদ নিতে সাহায্য করে।

❐ **ম্যান্ডিবল** (Mandible) : মুখছিদ্রের দুপাশে অবস্থিত, তিনকোণা ও কালো বা বাদামি রঙের বেশ ভিতরের দিকে সুঁচালো করাতের মতো দাঁতযুক্ত দুটি উপাঙ্গের নাম **ম্যান্ডিবল** বা **চোয়াল**। খাদ্য কেটে চি

পা (Legs): প্রতিটি বক্ষীয় খণ্ডের পার্শ্বদেশে একজোড়া করে মোট ছয়টি সন্ধিযুক্ত চলন অঙ্গ পা বিদ্যমান থাকে [পতঙ্গদের দেহে ছয়টি পা থাকার কারণে এদের হেক্সাপোডা (Hexapoda) বলা হয়]। প্রতিটি পা পাঁচটি খণ্ডক নিয়ে গঠিত এবং সকল খণ্ডকেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাঁটা থাকে। গোড়ার দিক হতে প্রান্তের দিকে খণ্ডকগুলো হলো- **কক্সা** (coxa), **ট্রকান্টার** (trochanter), **ফিমার** (femur), **টিবিয়া** (tibia) এবং **টারসাস** (tasus)।

চিত্র ২.২.৩ ঘাসফড়িং-এর পা

কক্সা বক্ষের সাথে যুক্ত থাকে। ট্রকান্টার ক্ষুদ্র এবং ফিমারের সাথে একত্রিত থাকে। ফিমার ও টিবিয়া লম্বা ও কাঁটাযুক্ত। টারসাস তিন খণ্ড বিশিষ্ট, প্রতিটি খণ্ডকে **টার্সোমিয়ার** (tarsomere) বলে। প্রথম টারসোমিয়ারের অঙ্কীয় দিকে প্লান্টুলা (plantula) নামক তিনটি নরম আসঞ্জন প্যাড থাকে। তৃতীয় টারসোমিয়ারের প্রান্তে দুটি বাঁকানো নখড় থাকে। নখড় দুটির মাঝে **পালভিলাস** (pulvilus) নামক একটি আসঞ্জন প্যাড থাকে।

ঘাসফড়িংয়ের সকল পায়ের গঠন একরকম নয়। এদের বক্ষের শেষ খণ্ডকের বা মেটাথোরাক্সের পা দুটির ফিমার অংশ বিশেষভাবে লম্বা ও মাংসল হয় যা লাফিয়ে চলার উপযোগী। এ ধরনের পাকে **স্যালটাটোরিয়াল পা** (Saltatorial legs) বলা হয়।

চিত্র ২.২.৩ : ঘাসফড়িং-এর মুখোপাঙ্গের বিভিন্ন অংশের চিত্ররূপ

❐ **ম্যাক্সিলা** (Maxilla) : ম্যান্ডিবলের পেছনে ও বাইরের দিকে প্রতিপাশে একটি করে লম্বাকার ম্যাক্সিলা থা প্রত্যেক ম্যাক্সিলা কয়েকটি খন্ডে বিভক্ত। সবচেয়ে গোড়ার খণ্ডটিকে **কার্ডো** (cardo) ও এরপর অবস্থিত খ **স্টাইপস** (stipes) বলে। স্টাইপসের অগ্রভাগে নখের মতো **ল্যাসিনিয়া** (lacinia) ও ঢাকনির মতো **গ্যালিয়া** (

নামক দুটি খণ্ড পাশাপাশি অবস্থান করে। গ্যালিয়ার পাশে পাঁচ অংশবিশিষ্ট **ম্যাক্সিলারি পাল্প** (maxillary palp) রয়েছে। এর উপর থাকে সূক্ষ্ম রোম। খাদ্যের স্বাদ গ্রহণ, এটি ধরে রাখতে, মুখের ভিতর প্রবেশ করাতে এবং খাদ্য চূর্ণকরণে সাহায্য করা ম্যাক্সিলার কাজ। ম্যাক্সিলারি পাল্প অ্যান্টেনা ও পায়ের অগ্রভাগ পরিষ্কারে অংশ নেয়, খাদ্যবস্তু হরণ প্রতিরোধ করে এবং সংবেদী অঙ্গ হিসেবে কাজ করে।

❐ **ল্যাবিয়াম** (Labium) : ঘাসফড়িং-এর মুখছিদ্রের নিচে মধ্যাংশ বরাবর স্থানে বহুসন্ধিল একটি ল্যাবিয়াম বা **অধঃওষ্ঠ** রয়েছে। ল্যাবিয়ামকে দ্বিতীয় জোড়া ম্যাক্সিলির প্রতিনিধি মনে করা হয়। এটি মূলত দুটি খণ্ডে বিভক্ত, যথা–**মেন্টাম** (mentum) ও **সাবমেন্টাম** (submentum)। প্রতিপাশে মেন্টামের মুক্ত প্রান্তে দুটি নড়নশীল **লিগুলি** (ligulae) এবং তিন সন্ধিযুক্ত **ল্যাবিয়াল পাল্প** (labial palp) থাকে। এটি খাবার ফসকে যাওয়া রোধ করে ও চর্বিত খাদ্য মুখে প্রবেশ করায়। ল্যাবিয়াল পাল্প সংবেদনশীল অঙ্গ হিসেবে কাজ করায় এটি উপযুক্ত খাদ্য নির্বাচনে সাহায্য করে।

❐ **হাইপোফ্যারিংক্স** (Hypopharynx) : ল্যাব্রামের নিচে ক্ষুদ্র, মাংসল হাইপোফ্যারিংক্স বা **উপজিহ্বাটি** অবস্থিত। এটি চারদিকে ম্যান্ডিবল, ম্যাক্সিলা ও ল্যাবিয়াম দিয়ে পরিবৃত থাকে। ল্যাবিয়ামের ভিতরের কিনারা থেকে সৃষ্ট একটি ঝিল্লি হাইপোফ্যারিংক্সের অংকীয়তলের সাথে যুক্ত থাকে। খাদ্যবস্তুকে নাড়াচাড়া করে লালার সাথে মেশাতে সাহায্য করাই এর কাজ।

খ. বক্ষ (Thorax)

মস্তকের পেছনে মাংসল বক্ষ একটি খাটো, সরু ও নমনীয় **গ্রীবা** (neck)-র সাহায্যে যুক্ত। ঘাসফড়িং-এর বক্ষাঞ্চল তিনটি অংশে বিভক্ত; যথা–**অগ্রবক্ষ** (prothorax), **মধ্যবক্ষ** (mesothorax) এবং **পশ্চাৎবক্ষ** (metathorax)। প্রত্যেক অংশের পৃষ্ঠদেশ **টার্গাম** (tergum), অঙ্কীয়দেশ **স্টার্নাম** (sternum) ও পার্শ্বদেশ **প্লিউরন** (pleuron)-এ গঠিত। এগুলো পাতলা কিউটিকলের পর্দা দিয়ে পরস্পর সংযুক্ত। অগ্রবক্ষের টার্গাম অংশটি বেশ বড়, চওড়া এবং পেছনে ও পাশে প্রসারিত। এর নাম **প্রোনোটাম** (pronotum)। বক্ষাঞ্চলে রয়েছে শ্বাসরন্ধ্র, ডানা ও পা।

১. শ্বাসরন্ধ্র বা স্পাইরাকল (Spiracle) : বক্ষের অঙ্কীয়-পার্শ্বদেশে দুজোড়া শ্বাসরন্ধ্র বা স্পাইরাকল অবস্থিত। প্রথম জোড়া প্রোনোটামের নিচে অগ্র ও মধ্যবক্ষের মাঝে এবং দ্বিতীয় জোড়া মধ্য ও পশ্চাৎবক্ষের মাঝে অবস্থিত।

চিত্র ২.২.৪ : ঘাসফড়িং-এর ডানা

২. ডানা (Wings) : মধ্য ও পশ্চাৎবক্ষের পিঠের দিকে অর্থাৎ টার্গাম ও প্লিউরনের মধ্যবর্তীস্থান থেকে একজোড়া করে, মোট দুজোড়া পাতলা কিউটিকল নির্মিত ডানা রয়েছে। ডানাগুলো প্রথম অবস্থায় দ্বিস্তরবিশিষ্ট প্রাচীর হিসেবে থলির মতো সৃষ্টি হয়, পরে পূর্ণাঙ্গ ডানায় পরিণত হয়। প্রত্যেক ডানা অসংখ্য ছোট নালির মতো ও রক্তে পূর্ণ শিরা-উপশিরায় গঠিত। দুজোড়া ডানার গঠন ও কাজ পৃথক ধরনের। মধ্যবক্ষীয় (mesothoracic) ডানা অর্থাৎ সামনের ডানাদুটি বেশ শক্ত, ছোট, সরু এবং কখনও উড়তে সাহায্য করে না। এগুলো পেছনের দুই ডানাকে ঢেকে রাখে। সেজন্য এগুলোকে **এলিট্রা** (elytra), ডানার আবরণ (wing covers) বা **টেগমিনা** (tegmina) হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। পেছনের বা পশ্চাৎবক্ষীয় (metathoracic) ডানাদুটি বেশ বড়, চওড়া, পর্দার মতো (membranous), স্বচ্ছ এবং উড়তে সাহায্য করে। বিশ্রামের সময় পেছনের ডানাজোড়া অগ্র ডানার নিচে গুটানো থাকে।

৩. পা (Legs) : বক্ষের প্রত্যেক অংশে একজোড়া করে মোট **তিনজোড়া পা** রয়েছে। প্রতিটি পা পাঁচখণ্ডে বিভক্ত: একেবারে গোড়ায় স্থূল, তিনকোণা **কক্সা** (coxa); এর পরের

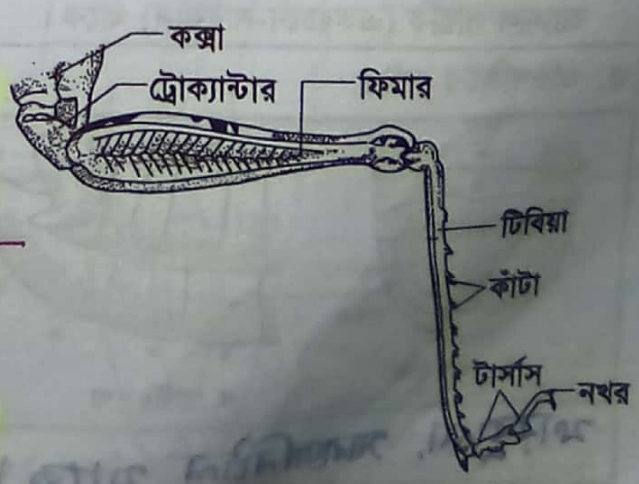

চিত্র ২.২.৫ : ঘাসফড়িং-এর একটি পায়ের বিভিন্ন অংশ

ত্রিভূজাকার ক্ষুদ্র **ট্রোক্যান্টার** (trochanter); পরের লম্বা, নলাকার ও দৃঢ় **ফিমার** (femur); তার পরবর্তী সরু (tibia); এবং সবশেষে **টার্সাস** (tarsus)। টার্সাস তিনটি ছোট উপখণ্ডকে বিভক্ত। এগুলোকে **টার্সা** (tarsomeres) বলে। টার্সাসের মাথায় সূঁচালো **নখর** (claws) থাকে। এ ছাড়াও প্রত্যেক পায়ের টিবিয়া ও অংশের পার্শ্বদেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সূঁচালো **কাঁটা** থাকে। ঘাসফড়িং-এর পা হাঁটা ও আরোহণে ব্যবহৃত হয়। তবে ফিমা অনেক বড় ও মাংসল গড়নের হওয়ায় এরা লাফিয়ে দূরের পথ অতিক্রম করতে পারে। টিবিয়া ও টার্সাস শক্ত হওয়ায় খাদ্য ধরতে সাহায্য করে।

গ. উদর (Abdomen)

ঘাসফড়িং-এর উদর বেশ লম্বা, সরু এবং ১১টি খণ্ডকে বিভক্ত। প্রত্যেক খণ্ডকের পৃষ্ঠদেশে **টার্গাম** (tergu অঙ্কীয়দেশে **স্টার্নাম** (sternum) থাকে, কোন প্লিউরন থাকে না। ১ম উদরীয় খণ্ডকটি অসম্পূর্ণ; কারণ, এ পশ্চাৎবক্ষের সাথে যুক্ত থাকে। এতে শুধু টার্গাম থাকে।

ঘাসফড়িং-এর উদরাঞ্চল নিচে বর্ণিত অঙ্গসমূহ বহন করে।

১. টিমপেনাম (Tympanum) : ১ম খণ্ডকের প্রতিপাশে একটি করে পর্দা রয়েছে যা শ্রবণ অঙ্গ বা (auditory sac)-কে আবৃত রাখে। এর নাম **টিমপেনিক পর্দা** বা টিমপেনাম।

২. শ্বাসরন্ধ্র (Spiracle) : ১ম থেকে ৮ম দেহখণ্ডক পর্যন্ত প্রতিটি খন্ডকের পার্শ্বদেশে এক জোড়া ক আটজোড়া শ্বাসরন্ধ্র বা স্পাইরাকল থাকে যার প্রথমটি অন্যান্যগুলো হতে আকারে বড়।

৩. পায়ু ও বহিঃজনন অঙ্গ : ৯ম ও ১০ম উদরীয় খণ্ডকের টার্গাম আংশিকভাবে ও স্টার্নাম পুরোপুরি একীভূ খণ্ডকের টার্গাম পায়ুর উপরে প্লেটের মতো একটি আবরণ (supra anal plate) তৈরি করে। পুরুষ ও স্ত্রী ঘাস উদর অঞ্চলের গঠনে কিছু পার্থক্য দেখা যায়। পুরুষ ঘাসফড়িং-এর ১০ম খন্ডের পেছন দিকের উভয় পাশে ছোট প্রক্ষেপক রয়েছে যা **অ্যানাল সারকাস** (anal cercus; বহুবচনে anal cerci) নামে পরিচিত। স্ত্রী ঘাস ৯ম স্টার্নাম লম্বাকৃতির যা স্ত্রীজননরন্ধ্র ধারণ করে। এদের উদরের শেষ প্রান্তে ৮ম ও ৯ম খন্ড অঙ্কীয়ভাবে একটি বিশেষ অঙ্গ তৈরি করে, যা **ওভিপজিটর** (ovipositor) নামে পরিচিত।

পুরুষ ও স্ত্রী ঘাসফড়িং-এর তুলনা

সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণে পুরুষ ও স্ত্রী ঘাসফড়িংয়ের বহির্গঠনে কিছু সুস্পষ্ট পার্থক্য দেখা যায়।

পুরুষ ঘাসফড়িং	স্ত্রী ঘাসফড়িং
১. দেহ স্ত্রী ঘাসফড়িং-এর তুলনায় সার্বিকভাবে খাটো ও সরু।	১. দেহ অপেক্ষাকৃত লম্বা, চওড়া ও চাপা।
২. উদরের অগ্রভাগ গোলাকার, নবম খন্ডকের স্টার্নাম লম্বাটে এবং সঙ্গমাঙ্গকে আবৃত করে থাকে।	২. উদর সরু এবং ডিম পাড়ার জন্য কয়েকটি উপাঙ্গ এ অংশের সাথে যুক্ত থাকে।
৩. ডানা উদর আবৃত করে কিছুটা বর্ধিত থাকে।	৩. ডানা দেহের উদর অঞ্চলের পশ্চাতে বর্ধিত
৪. দশম খণ্ডের পেছন দিকে উভয় পাশে একজোড়া **অ্যানাল সারকি** (একবচনে-সারকাস) থাকে।	৪. অ্যানাল সারকি অনুপস্থিত।
৫. ওভিপজিটর নেই।	৫. উদর ক্রমান্বয়ে সরু এবং শেষ প্রান্তে একটি অতিপজি

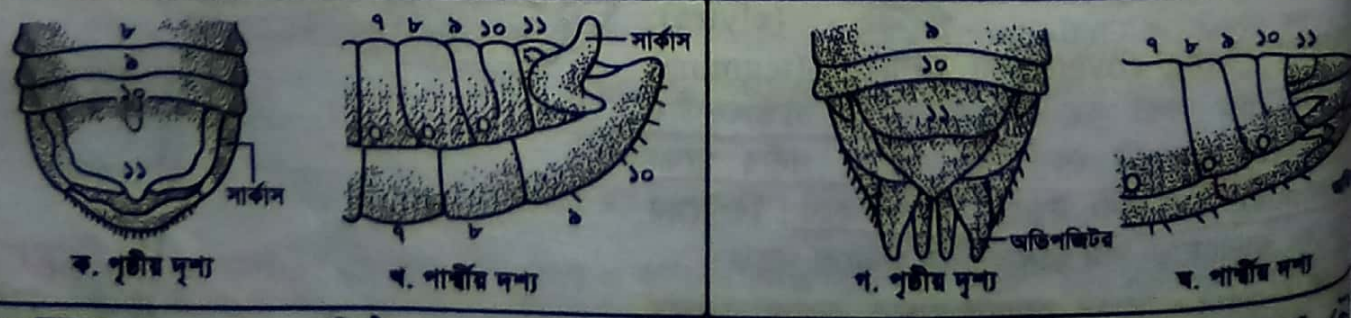

চিত্র ২.৭ : ঘাসফড়িং-এর উদরপ্রান্ত

ঘাসফড়িং-এর পৌষ্টিকতন্ত্র (Digestive System of Grasshopper)

ঘাসফড়িং-এর খাদ্যাভ্যাসের সাথে পৌষ্টিকতন্ত্র অভিযোজিত এবং প্রধান দুটি অংশ নিয়ে গঠিত। যথা-**পৌষ্টিকনালি** ও **পৌষ্টিকগ্রন্থি**। ছকের মাধ্যমে পৌষ্টিকতন্ত্রের বিভিন্ন অংশ দেখানো হলো।

পৌষ্টিকতন্ত্র

- **পৌষ্টিকনালি**
  - **স্টোমোডিয়াম**
    - ১. মুখছিদ্র
    - ২. গলবিল
    - ৩. গ্রাসনালি
    - ৪. ক্রপ
    - ৫. গিজার্ড
  - **মেসেন্টেরন**
  - **প্রোক্টোডিয়াম**
    - ১. ইলিয়াম
    - ২. কোলন
    - ৩. রেকটাম
    - ৪. পায়ুছিদ্র
- **পৌষ্টিকগ্রন্থি**
  - **লালাগ্রন্থি**
  - **মেসেন্টেরনের অন্তঃআবরণ**
  - **হেপাটিক সিকা**

নিচে ঘাসফড়িং-এর পৌষ্টিকতন্ত্রের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো।

পৌষ্টিকনালি (Alimentary Canal)

ঘাসফড়িং-এর পৌষ্টিকনালি সরল প্রকৃতির এবং **মুখছিদ্র** থেকে **পায়ুছিদ্র** পর্যন্ত দেহের মধ্যরেখা বরাবর সোজা নালি হিসেবে অবস্থিত। বর্ণনার সুবিধার জন্য তিনটি অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে— **স্টোমোডিয়াম, মেসেন্টেরন** ও **প্রোক্টোডিয়াম**।

১. স্টোমোডিয়াম বা অগ্র-পৌষ্টিকনালি (Stomodaeum or Foregut) : এটি মুখছিদ্র থেকে গিজার্ড পর্যন্ত বিস্তৃত পৌষ্টিকনালির প্রথম অংশ। ভ্রূণীয় এক্টোডার্ম থেকে উদ্ভূত এ অংশটির অন্তঃপ্রাচীর **কাইটিন** (chitin) নির্মিত শক্ত আবরণে আবৃত। এটি প্রধানত নিচে উল্লেখিত অংশগুলো নিয়ে গঠিত।

ক. মুখছিদ্র (Mouth) : এটি প্রাকমৌখিক প্রকোষ্ঠ (preoral cavity) বা **সিবেরিয়াম** (cibarium) নামক প্রকোষ্ঠের গোড়ায় অবস্থিত ছিদ্রবিশেষ। প্রকোষ্ঠটি মুখোপাঙ্গে বেষ্টিত থাকে।

কাজ : সিবেরিয়ামে খাদ্যবস্তু গৃহীত হয় এবং মুখছিদ্র খাদ্য দেহে প্রবেশের দ্বার হিসেবে কাজ করে।

খ. গলবিল (Pharynx) : মুখছিদ্রটি ছোট নলাকার ও পেশিবহুল গলবিলে উন্মুক্ত।

কাজ : এর মাধ্যমে খাদ্যবস্তু গ্রাসনালিতে প্রবেশ করে।

গ. গ্রাসনালি (Oesophagus) : এটি গলবিলের পেছনে সরু, সোজা, নলাকার পাতলা প্রাচীরবিশিষ্ট নালি।

কাজ : খাদ্যবস্তু মুখ থেকে বহন করে ক্রপে পৌঁছায়।

ঘ. ক্রপ (Crop) : গ্রাসনালি স্ফীত হয়ে মোচাকার থলির মতো ও পাতলা প্রাচীরযুক্ত ক্রপ গঠন করে।

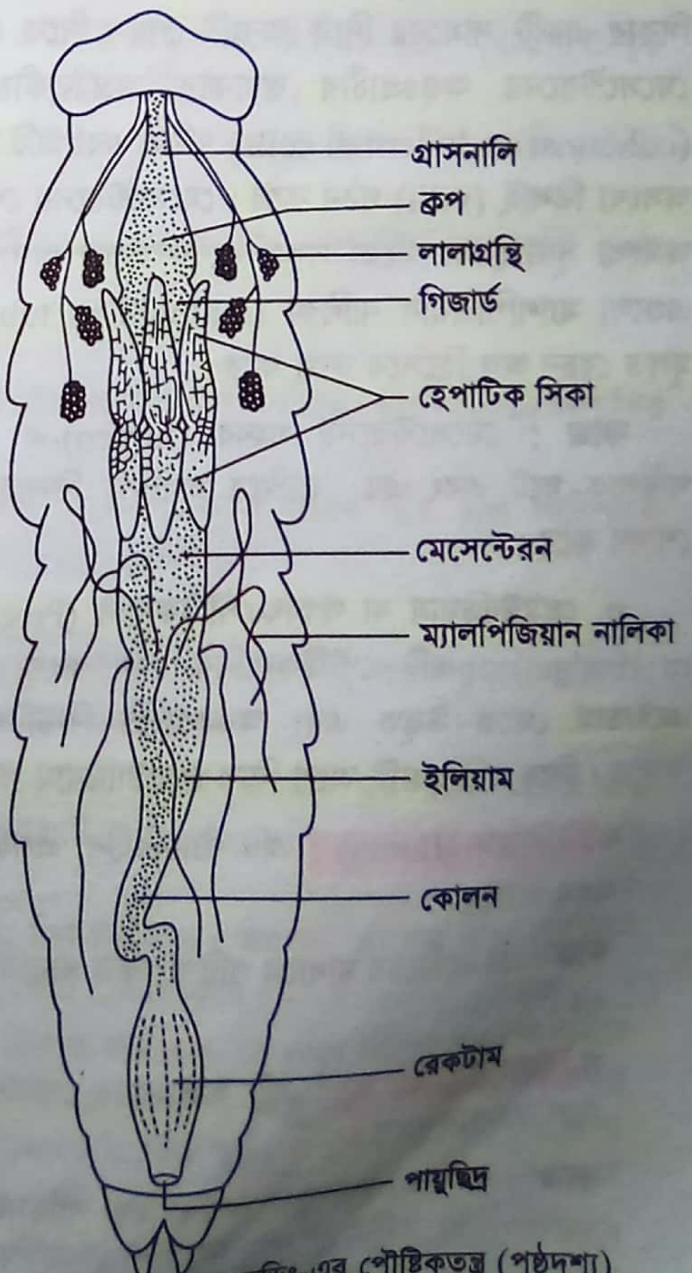

চিত্র ২.২.৭ : ঘাসফড়িং-এর পৌষ্টিকতন্ত্র (পৃষ্ঠদৃশ্য)

কাজ : খাদ্যবস্তু কিছু সময়ের জন্য এখানে জমা থাকে। ক্রপের সংকোচন প্রসারণে খাদ্য কিছুটা চূর্ণ হয় লালার এনজাইম পরিপাকের সূত্রপাত ঘটায়।

ঙ. গিজার্ড বা প্রোভেন্ট্রিকুলাস (Gizzard or Proventriculus): এটি ক্রপের পরবর্তী ত্রিকোণাকার বেশ পুরু প্রাচীর বিশিষ্ট এবং অন্তঃপ্রাচীরের কাইটিনময় ছটি দাঁত ও ছটি অনুলম্ব ভাঁজ নিয়ে গঠিত অংশ। দাঁতের চুল ও ছটি প্যাড থাকে। এর পরের অংশে থাকে পেছনে প্রসারিত কপাটিকা।

কাজ : গিজার্ডের দৃঢ় সংকোচন-প্রসারণ খাদ্যকে চূর্ণ করে; প্যাডের চুলগুলো খাদ্যকণাকে মেসেন্টেরনে প্রবেশ সময় ছাঁকনির কাজ করে; এবং কপাটিকাগুলো খাদ্যকে বিপরীতদিকে আসতে বাধা দেয়।

২. মেসেন্টেরন বা মধ্য-পৌষ্টিকনালি বা পাকস্থলি (Mesenteron or Midgut) : গিজার্ডের পর থেকে শুরু উদরের মধ্যাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত পাতলা প্রাচীরবিশিষ্ট অংশটি মেসেন্টেরন। এটি ভ্রূণীয় এণ্ডোডার্ম স্তর থেকে সৃষ্টি হয় এর অন্তঃপ্রাচীর কিউটিকলের পরিবর্তে **পেরিট্রপিক পর্দা** দিয়ে আবৃত। মেসেন্টেরনের অগ্র ও পশ্চাৎ প্রান্তে **পেশি** বা **স্ফিংটার** (sphincter) থাকে। মেসেন্টেরন এবং স্টোমোডিয়ামের সংযোগস্থলে ৬ জোড়া ফাঁপা, লম্বা মোচাকার থলি থাকে। সেগুলো হচ্ছে **গ্যাস্ট্রিক সিকা** (gastric caeca) বা **হেপাটিক সিকা** (hepatic caeca)। প্রতিজোড়া হেপাটিক সিকার একটি সামনের দিকে অন্যটি পেছন দিকে প্রসারিত। মেসেন্টেরনের অন্তঃপ্রাচীর স্তম্ভাকার অন্তঃত্বকীয় কোষে (columnar endodermal cells) গঠিত এবং এটি ভাঁজ হয়ে অসংখ্য **ভিলাই** (villi) গঠন করে। মেসেন্টেরনের শেষ অংশে অসংখ্য সূক্ষ্ম চুলের মতো সবুজ বর্ণের হলদে অঙ্গাণু থাকে। এগুলো **ম্যালপিজিয়ান নালিকা** (malpighian tubules) যা মূলত রেচন অঙ্গ হিসেবে কাজ করে।

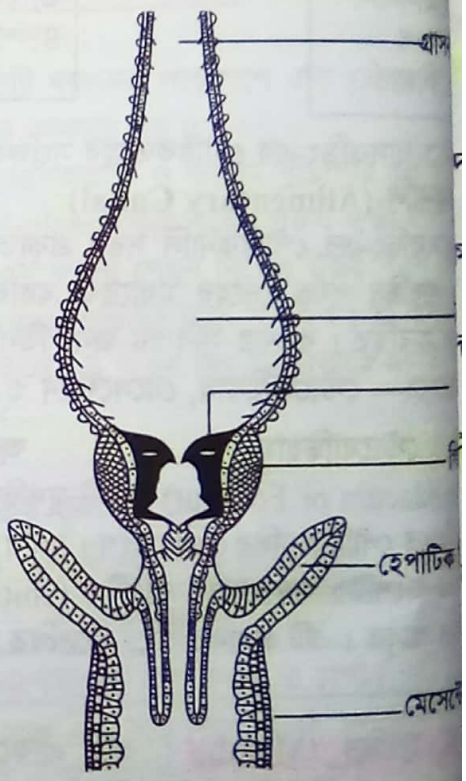

চিত্র ২.২.৮ : স্টোমোডিয়াম ও মেসেন্টেরনের

কাজ : মেসেন্টেরনের গহ্বর (lumen)-এ খাদ্যবস্তুর পরিপাক ঘটে এবং এর প্রাচীরে অবস্থিত ভিলাই খাদ্যরস শোষণ করে।

৩. প্রোক্টোডিয়াম বা পশ্চাৎ-পৌষ্টিকনালি (Proctodaeum or Hindgut) : এটি পৌষ্টিকনালির শেষ অংশ যা ভ্রূণীয় এক্টোডার্ম থেকে উদ্ভূত এবং অন্তঃপ্রাচীর কিউটিকল দিয়ে আবৃত। নিচে বর্ণিত ৪টি অংশ নিয়ে প্রোক্টোডিয়াম গঠিত।

ক. ইলিয়াম (Iluem) : এটি প্যাঁচবিহীন, প্রশস্ত নলাকার প্রথম অংশ।

কাজ : এর প্রাচীরের মাধ্যমে পরিপাককৃত খাদ্যরস শোষিত হয়।

খ. কোলন (Colon) : এটি ইলিয়ামের পেছনে অবস্থিত সরু নলাকার অংশ।

কাজ : পাচিত খাদ্যবস্তুর অবশিষ্টাংশ পানিসহ শোষিত হয়।

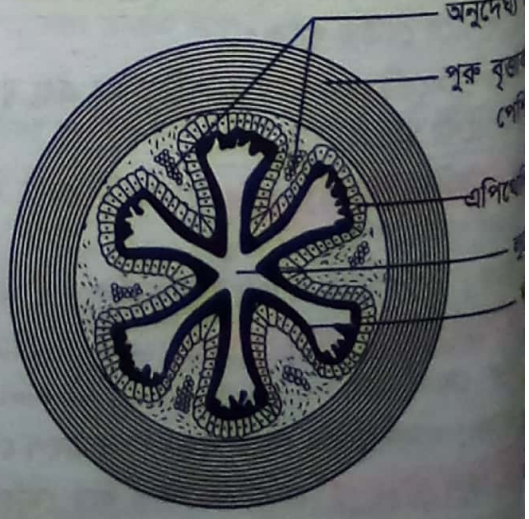

চিত্র ২.২.৯ : গিজার্ডের প্রস্থচ্ছেদ

লালরসে - অ্যামাইলেজ, কাইটিনেজ ও সেলুলেজ এনজাইম থাকে।

গ. রেকটাম বা মলাশয় (Rectum) : এটি পৌষ্টিকনালির সর্বশেষ স্ফীত ও পুরু প্রাচীরযুক্ত অংশ। এর অন্তঃস্থ প্রাচীরে ছয়টি **রেকটাল প্যাপিলা** (rectal papilla; বহুবচনে- papillae) নামক অনুলম্ব ভাঁজ রয়েছে।

কাজ : মল থেকে অতিরিক্ত পানি, খনিজ লবণ, অ্যামিনো এসিড শোষণ করা এবং অপাচ্য অংশ সাময়িক জমা রাখা এর কাজ।

ঘ. পায়ুছিদ্র (Anus) : এটি মলাশয়ের শেষপ্রান্তে অবস্থিত ছিদ্রপথ। এটি দশম দেহখণ্ডকের অঙ্কদেশে উন্মুক্ত হয়।

কাজ : অপাচ্য অংশ **মল** (faeces) হিসেবে দেহ থেকে অপসারণ করা।

চিত্র ২.২.১০ : রেকটামের প্রস্থচ্ছেদ

পৌষ্টিকগ্রন্থি (Digestive Glands)

ঘাসফড়িং-এর লালাগ্রন্থি, মেসেন্টেরনের অন্তঃআবরণ এবং হেপাটিক সিকা পৌষ্টিকগ্রন্থি হিসেবে কাজ করে। নিচের এদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হলো।

১. লালাগ্রন্থি (Salivary glands) : এটি ঘাসফড়িং-এর প্রধান পৌষ্টিক গ্রন্থি। ক্রপের নিচে ক্ষুদ্র, শাখাপ্রশাখা-যুক্ত একজোড়া লালাগ্রন্থি অবস্থিত। লালাগ্রন্থির নালি ল্যাবিয়ামের গোড়ায় গলবিলে উন্মুক্ত হয়।

কাজ : লালাগ্রন্থি থেকে নিঃসৃত **লালরস** (saliva) খাদ্য গলাধঃকরণ ও চর্বনে সাহায্য করে। কিছু শর্করা জাতীয় খাদ্য পরিপাকেও এটি ভূমিকা পালন করে।

২. মেসেন্টেরন বা মধ্য-পৌষ্টিকনালির অন্তঃআবরণ : মেসেন্টেরনের অন্তঃপ্রাচীরে বেশ কিছু **ক্ষরণকারী কোষ** (secretary cells) আছে যা থেকে পাচকরস ক্ষরিত হয়।

কাজ : ক্ষরিত পাচকরস খাদ্য পরিপাকে অংশ নেয়।

৩. হেপাটিক সিকা (Hepatic caeca) : অগ্র ও মধ্য-পৌষ্টিকনালির সংযোগস্থলে অবস্থিত কোণ (cone) আকৃতির ছয়জোড়া লম্বা স্বচ্ছ নালিকাকে হেপাটিক বা গ্যাস্ট্রিক সিকা বলে।

কাজ : হেপাটিক সিকার অন্তঃপ্রাচীরে অবস্থিত ক্ষরণকারী কোষ থেকে পাচকরস ক্ষরিত হয়ে খাদ্য পারিপাকে সহায়তা করে।

খাদ্য গ্রহণ ও পরিপাক (Feeding & Digestion)

খাদ্য : ঘাসফড়িং সম্পূর্ণ **তৃণভোজী** বা **শাকাশী** (herbivorous) প্রাণী। ঘাস, শস্যদানা, লতা-পাতা খেয়ে এরা জীবনধারণ করে। এদের খাবারে শর্করা, আমিষ ও স্নেহজাতীয় সমস্ত উপাদানই থাকে।

খাদ্য গ্রহণ পদ্ধতি : ঘাসফড়িংয়ের যে মুখোপাঙ্গ তা শুধু চিবানোর কাজে ব্যবহৃত হয় বলে, এদের খাদ্য গ্রহণকে **চর্বণ** (chewing) এবং মুখোপাঙ্গকে **চর্বণ-উপযোগী** বা **ম্যান্ডিবুলেট** (chewing or mandibulate) মুখোপাঙ্গ বলে।

ঘাসফড়িং প্রথমে ম্যাক্সিলারি ও ল্যাবিয়াল পাল্পের মাধ্যমে খাদ্য নির্বাচন করে। অগ্রপদ, ল্যাব্রাম এবং ল্যাবিয়াম খাদ্যবস্তু আটকে ধরে। ম্যান্ডিবল এবং ম্যাক্সিলি খাদ্যবস্তুর ক্ষুদ্র অংশ কেটে চোষণ করে।

পরিপাক : খাদ্য প্রাকমৌখিক প্রকোষ্ঠে পৌঁছার পরই লালাগ্রন্থি নিঃসৃত **লালরস**-এর সাথে মিশ্রিত হয়। লালারসে অ্যামাইলেজ, কাইটিনেজ ও সেলুলেজ এনজাইম থাকে যা বিভিন্ন ধরনের শর্করাকে আর্দ্র বিশ্লেষণ করে। খাদ্যবস্তু প্রাকমৌখিক প্রকোষ্ঠ থেকে ক্রপে পৌঁছায়। এখান থেকে খাদ্যবস্তু গিজার্ডে প্রেরিত হয়। আংশিক পরিপাককৃত খাদ্য গিজার্ডে প্রবেশ করলে কাইটিনময় দাঁতে পিষ্ট হয়ে অতি সূক্ষ্ম কণাসমৃদ্ধ **পেস্ট** (paste)-এ পরিণত হয়। এগুলো গিজার্ডে অবস্থিত সূক্ষ্ম রোমে পরিস্রুত হয়ে মেসেন্টেরনে প্রবেশ করে। মেসেন্টেরনের অন্তর্গাত্র এবং হেপাটিক সিকা ক্ষরণ ও শোষণতলরূপে কাজ করে। মেসেন্টেরনে মলটেজ, ট্রিপটেজ, অ্যামাইলেজ, ইনভার্টেজ, লাইপেজ প্রভৃতি এনজাইমের

উপস্থিতিতে খাদ্যবস্তু সরল, তরল খাদ্যরসে পরিণত হয়। পরিপাককৃত খাদ্যবস্তু মেসেন্টেরনের কোষীয় প্রাচীরের
পরিশোধিত হয়ে হিমোসিলে প্রবেশ করে সারা দেহে পরিবাহিত হয়।

অজীর্ণ খাদ্যবস্তু কোলনের ভেতর দিয়ে মলাশয়ে পৌছার আগেই কোলনের প্রাচীর তা থেকে পানি, লবণ,
এসিড ও অজৈব আয়ন শোষণ করে নেয়। পরে কঠিন অপাচ্য বস্তু মলরূপে পায়ু পথে বাইরে নির্গত হয়।

ব্যবহারিক অংশ

ঘাসফড়িং/ আরশোলার মুখোপাঙ্গ পর্যবেক্ষণ

সরবরাহকৃত একটি মৃত **ঘাসফড়িং** বা **আরশোলা** নিয়ে বাম হাতের আঙ্গুল দিয়ে প্রাণিটির পৃষ্ঠদেশ চেপে ধ
হাতের তীক্ষ্ণ চিমটা দিয়ে মুখছিদ্রের চারদিকে অবস্থিত মুখোপাঙ্গগুলো অর্থাৎ ল্যাব্রাম, ল্যাবিয়াম, ম্যাক্সিলা, ম্যান্ডি
হাইপোফ্যারিংক্স তুলে স্লাইডে রাখতে হবে। ব্যবচ্ছেদ শুরু করার আগেই একটি স্লাইডে দু'তিন ফোটা গ্লিসারি
রাখতে হবে। মুখোপাঙ্গগুলো ভালভাবে পরীক্ষার পর চিত্র দেখে ব্যবহারিক খাতায় ছবি এঁকে বিভিন্ন অংশ নির্দেশ
হবে (ঘাসফড়িং-এর মুখোপাঙ্গের বিভিন্ন অংশের বর্ণনা তত্ত্বীয় অংশে উল্লেখ করা হয়েছে)।

ঘাসফড়িং-এর মুখোপাঙ্গের চিত্র: ২.২.৩

চিত্র ২.২.১১ : আরশোলার মুখোপাঙ্গের চিত্ররূপ

ঘাসফড়িং / আরশোলার পৌষ্টিকতন্ত্র পর্যবেক্ষণ

একটি সদ্যমৃত বা নিস্তেজ ঘাসফড়িং বা আরশোলার ডানা কেটে বাম হাতে ধরে বক্ষ উদরের টার্গা ও স্টার্ণা পৃথক করার জন্য দেহের দুপাশ বরাবর সূক্ষ্মকাঁচি প্রবেশ করিয়ে কাটতে হবে। প্রাণিটিকে এখন পানিপূর্ণ ট্রেতে পিঠ উপরে রেখে পিন দিয়ে আটকে দিতে হবে। চিমটার সাহায্যে একটির পর একটি টার্গা ছাড়াতে হবে। এভাবে বক্ষ ও উদর মুক্ত করার পর ব্যবহৃত পানি ফেলে দিয়ে পরিষ্কার পানি দিয়ে ট্রে ভর্তি করতে হবে। পৌষ্টিকনালিকে একটু টেনে একপাশে পিন দিয়ে আটকে বিভিন্ন অংশ পর্যবেক্ষণ (তত্ত্বীয় অংশে বিশদ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে) করে চিত্র এঁকে চিহ্নিত করতে হবে। **ঘাসফড়িং-এর পৌষ্টিকতন্ত্রের চিত্র নং-২.২.৭।**

লালাগ্রন্থি পর্যবেক্ষণ

পৌষ্টিকনালি ব্যবচ্ছেদ করার সময় অন্ননালি পর্যন্ত বের করে ধীরে ধীরে সুঁচ এবং চিমটার সাহায্যে চর্বি ও মাংসপেশিগুলো ছাড়াতে হবে। সাদা পাতার মতো দেখতে **লালাগ্রন্থি** দেখার সাথে সাথে লালাগ্রন্থি নালির অবস্থান লক্ষ করে ধীরে ধীরে উপরের দিকে উপ-জিহ্বা (হাইপোফ্যারিংক্স) পর্যন্ত অগ্রসর হতে হবে। লক্ষ রাখতে হবে যে

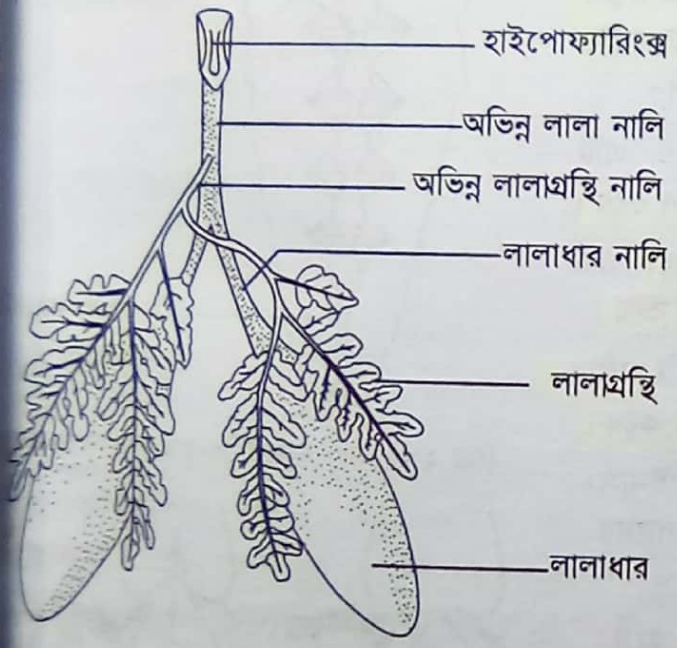

চিত্র ২.২.১২ : আরশোলার লালাগ্রন্থি

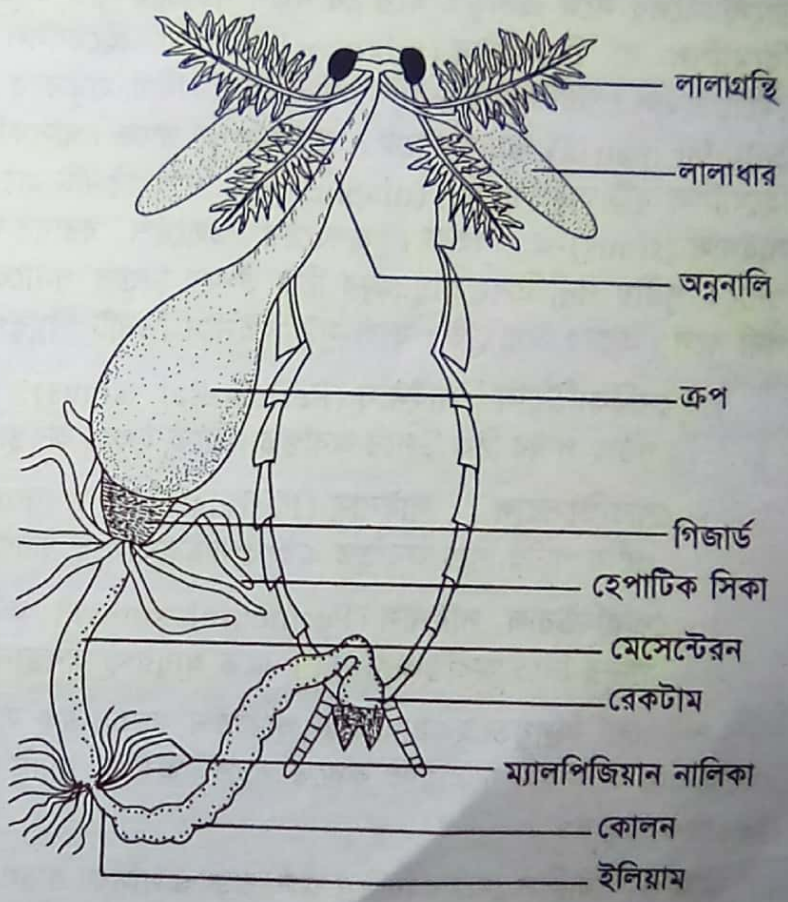

চিত্র ২.২.১৩ : আরশোলার পৌষ্টিকতন্ত্র

লালাগ্রন্থিগুলোর মাঝখানে উভয় পাশে একটি করে বেলুনের মতো যে **লালাধার** রয়েছে তা যেন ছিঁড়ে না যায়। **হাইপোফ্যারিংক্স**সহ অভিন্ন **লালাগ্রন্থি নালি, লালাগ্রন্থি** ও **লালাধার** তুলে একটি স্লাইডে রাখতে হবে। এবার স্লাইডকে সরল অণুবীক্ষণযন্ত্রের নিচে রেখে ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করে চিহ্নিত চিত্র আঁকতে হবে।

ঘাসফড়িং-এর রক্ত সংবহনতন্ত্র (Blood Circulatory System)

জীবদেহের প্রয়োজনীয় উপাদান, পুষ্টি দ্রব্য, হরমোন ইত্যাদি রক্তের মাধ্যমে দেহকোষে পৌছানো এবং দেহকোষ বিপাকে সৃষ্ট বর্জ্য একইভাবে রেচন অঙ্গে নিয়ে আসার প্রক্রিয়ার নামই সংবহন। রক্তের পথ অনুসারে প্রাণিদেহে দুই ধরনের রক্ত সংবহনতন্ত্র দেখা যায়, যেমন-**মুক্ত** (open) বা **ল্যাকুনার** (lacunar) এবং **বদ্ধ** (closed) **সংবহনতন্ত্র**।

মুক্ত সংবহন : যে সংবহনতন্ত্রে রক্ত হৃৎযন্ত্র থেকে নালিকা পথে বের হয়ে উন্মুক্ত দেহগহ্বরে প্রবেশ করে দেহগহ্বর থেকে পুনরায় নালিকা পথে হৃৎযন্ত্রে ফিরে আসে তার নাম মুক্ত সংবহন। অর্থাৎ রক্ত সবসময় রক্তবাহিকার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয় না। চিড়িং, পতঙ্গ, মলাস্কা প্রভৃতি প্রাণীর দেহে এ ধরনের সংবহন দেখা যায়।

বদ্ধ সংবহন : যে সংবহনতন্ত্রে রক্ত সবসময় রক্তবাহিকা ও হৃৎযন্ত্রের মাধ্যমে সম্পূর্ণ আবদ্ধ থেকে প্রবাহিত হয় কখনোই দেহ গহ্বরে মুক্ত হয় না তাকে বলে বদ্ধ সংবহন। অ্যানিলিড জাতীয় অমেরুদন্ডী প্রাণিদেহে এবং সকল মেরু প্রাণীতে এ ধরনের সংবহন দেখা যায়।

ঘাসফড়িং-এর রক্ত সংবহনতন্ত্র অনুন্নত ও **মুক্ত** ধরনের এবং তিনটি প্রধান অংশে বিভক্ত–**হিমোসিল, হিমোলিম্ফ** ও **পৃষ্ঠীয় বাহিকা**। নিচে এসব অংশের বর্ণনা দেয়া হলো।

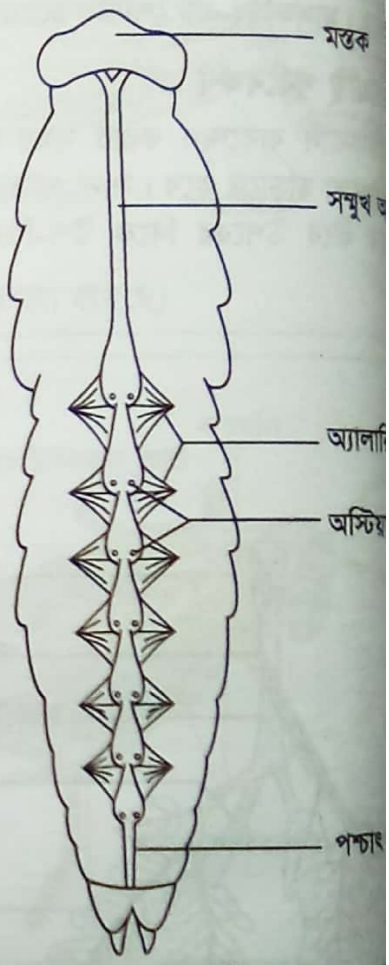

চিত্র ২.২.১৪ : ঘাসফড়িং-এর রক্ত সং

ক. হিমোসিল (Haemocoel; গ্রিক, *haima* = রক্ত + *koiloma* = গহ্বর) : ভ্রূণীয় পরিস্ফুটনের সময় প্রধান সিলোমিক গহ্বর ব্লাস্টোসিলের সঙ্গে একীভূত হয়ে যে নতুন গহ্বরের সৃষ্টি করে তাকে হিমোসিল বা **মিক্সোসিল** (mixocoel) বলে। হিমোসিল তখন মেসোডার্মাল পেরিটোনিয়ামের পরিবর্তে বহিঃকোষীয় মাতৃকায় (extra cellular matrix) আবৃত থাকে। এটি রক্তপূর্ণ থাকে। ঘাসফড়িং-এর হিমোসিল দুটি অনুপ্রস্থ পর্দা (diaphragm) দিয়ে তিনটি প্রকোষ্ঠ বা **সাইনাস** (sinus)-এ বিভক্ত। হৃৎযন্ত্রের তলদেশ বরাবর অবস্থিত পর্দাকে **পৃষ্ঠীয় পর্দা** এবং স্নায়ুরজ্জুর ঠিক উপরে বিস্তৃত পর্দাকে **অঙ্কীয় পর্দা** বলে। এদের উপস্থিতির ফলে সৃষ্ট সাইনাস-তিনটি নিম্নরূপ–

i. **পেরিকার্ডিয়াল সাইনাস** (Pericardial sinus) : এটি পৃষ্ঠীয় পর্দার ঠিক উপরে অবস্থিত। এতে হৃৎযন্ত্র অবস্থান করে।

ii. **পেরিভিসেরাল সাইনাস** (Perivisceral sinus) :এটি পৃষ্ঠীয় পর্দার নিচে অবস্থিত এবং পৌষ্টিকনালিকে ধারণ করে।

iii. **পেরিনিউরাল সাইনাস** (Perineural sinus) : এটি অঙ্কীয় পর্দার নিচে অবস্থিত গহ্বর। এতে স্নায়ুরজ্জু অবস্থান করে।

পর্দাগুলো ছিদ্রযুক্ত হওয়ায় রক্ত প্রয়োজন মতো এক সাইনাস থেকে অন্য সাইনাসে যাতায়াত করতে পারে। অঙ্কীয় পর্দাটি পায়ের ভিতরেও বিস্তৃত।

কাজ : হিমোসিল দেহের বিভিন্ন অঙ্গ, রক্ত ও লসিকা ধারণ করে। এর মাধ্যমে খাদ্যরস ও বর্জ্যবস্তু পরিবাহিত হয়।

খ. হিমোলিম্ফ (Haemolymph) বা **রক্ত** : বর্ণহীন প্লাজমা এবং এর মধ্যে ভাসমান অসংখ্য বর্ণহীন রক্তকণিকা বা **হিমোসাইট** (haemocyte) নিয়ে ঘাসফড়িং-এর রক্ত গঠিত। রক্ত হিমোসিল নামক গহ্বরে **লসিকা** (lymph)-র সাথে মিশ্রিত অবস্থায় থাকে বলে ঘাসফড়িংসহ বিভিন্ন পতঙ্গের রক্তকে হিমোলিম্ফ বলে। হিমোগ্লোবিন বা অন্য কোন ধরনের শ্বাসরঞ্জক না থাকায় এর রক্ত বর্ণহীন, শ্বসনে তেমন কোন ভূমিকা রাখে না।

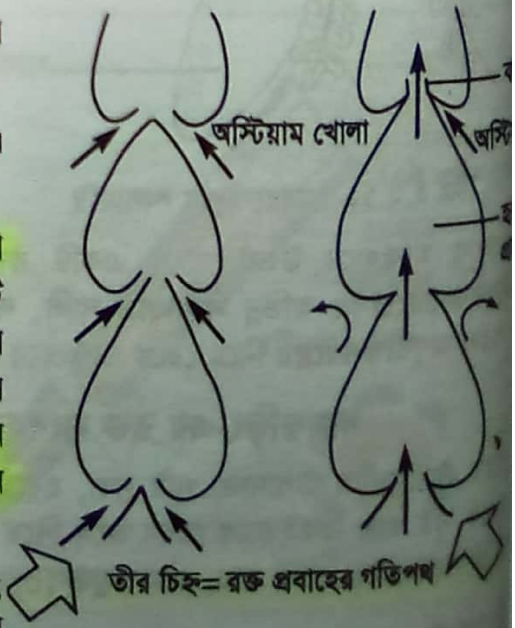

চিত্র ২.২.১৫ : হৃৎযন্ত্রের আংশিক বর্ধিত চি

কাজ : খাদ্যসার, রেচনদ্রব্য, হরমোন ইত্যাদি পরিবহনে; অ্যামিনো এসিড, কার্বোহাইড্রেট প্রভৃতি জমা রাখা, জীবাণু ধ্বংস করা, তঞ্চনে সাহায্য করা এবং ডানার সঞ্চালন ও খোলস মোচনে সহায়তা করা হিমোলিম্ফের কাজ।

গ. পৃষ্ঠীয় বাহিকা (Dorsal vessel) : দেহের মধ্য-পৃষ্ঠীয় অবস্থানে রক্ষিত এটি প্রধান **স্পন্দনশীল অঙ্গ**। এ অঙ্গ দুটি অংশে বিভক্ত– (i) অস্টিয়াবিহীন সোজা নলাকার **সম্মুখ ও পশ্চাৎ অ্যাওর্টা** এবং (ii) **হৃৎযন্ত্র**। ঘাসফড়িং-এ একটি লম্বাটে, নলাকার হৃৎযন্ত্র থাকে। এটি বক্ষ ও উদরীয় অঞ্চলের পৃষ্ঠদেশে মাঝ বরাবর যে গহ্বরে থাকে তাকে **পেরিকার্ডিয়াল সাইনাস** (pericardial sinus) বলে। হৃৎযন্ত্রটি সাতটি ফানেল আকার প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। প্রতিটি প্রকোষ্ঠে পার্শ্বীয় দিকে একটি করে মোট একজোড়া ছিদ্র বিদ্যমান। ছিদ্রগুলোকে **অস্টিয়া** (ostia, একবচনে- ostium) বলে। অস্টিয়ামে **কপাটিকা** (valve) থাকে, যা রক্তকে হৃৎযন্ত্রে কেবলমাত্র প্রবেশ করতে দেয় কিন্তু বের হতে দেয় না। টারগামের অঙ্কীয় তলের দুপাশ থেকে **অ্যালারি পেশি** (alary muscle) নামক ত্রিকোণাকার পাখার মতো বিশেষ ধরনের পেশি উৎপন্ন হয়ে পেরিকার্ডিয়াল সাইনাসের প্রাচীরে যুক্ত হয় এবং হৃৎযন্ত্রের পার্শ্বীয়-অঙ্কীয় দেশেও যুক্ত থাকে। ঘাসফড়িংয়ে ৬ জোড়া অ্যালারি পেশি থাকে। এদের সংকোচন প্রসারণ রক্ত সংবহনে গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করে।

রক্ত সংবহন প্রক্রিয়া (Mechanism of Blood Circulation)

হৃৎযন্ত্র ও অ্যালারি পেশির সংকোচন-প্রসারণের ফলেই ঘাসফড়িং-এর দেহের বিভিন্ন অঞ্চলে রক্ত প্রবাহিত হয়। হৃৎযন্ত্রের প্রতিটি প্রকোষ্ঠ ক্রমাগত ঢেউয়ের মতো সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হয়। ঘাসফড়িং-এর হৃৎযন্ত্রের স্পন্দন প্রতি মিনিটে ১০০ থেকে ১১০ বার। রক্ত সংবহন প্রক্রিয়াটি নিম্নোক্তভাবে সম্পাদিত হয়।

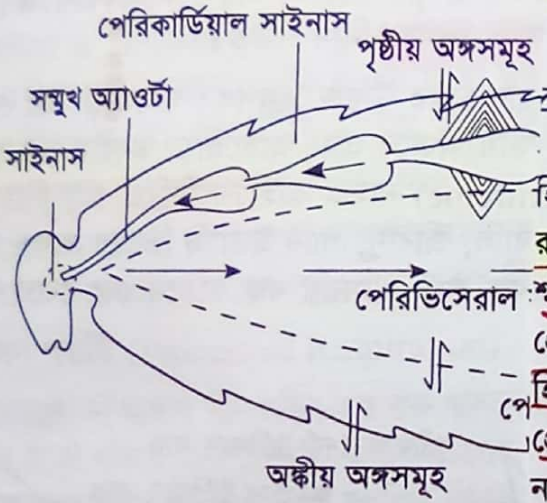

চিত্র ২.২.১৬ : ঘাস

ঘাসফড়িংয়ের রক্তকে **হিমোলিম্ফ** (haemolymph) বলে। হিমোলিম্ফ প্রধ

(ক) রক্তরস (Plasma): এটি বর্ণহীন তরল। এর 70%ই পানি। এতে দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে।

(খ) রক্তকণিকা (Haemocytes): ঘাসফড়িংয়ের রক্তরসে হিমোসাইট নামক বর্ণহীন শ্বেতকণিকা থাকে। এদের প্রতি ঘন মিমি রক্তে 15-60 হাজার হিমোসাইট থাকে। ঘাসফড়িংয়ের রক্তে কোনো শ্বসন রঞ্জক থাকে না। হিমোসাইট তিন ধরনের হয়, যথা- প্রোহিমোসাইট (23%), ট্রানজিশনাল হিমোসাইট (68%) এবং বৃহৎ হিমোসাইট (9%)। **Arnold** (1972) এর মতে ঘাসফড়িংয়ের রক্তরসে প্রোহিমোসাইট, প্লাজমাটোসাইট, গ্রানুলোসাইট এবং স্ফেরিওল কোষ নামক চার ধরনের হিমোসাইট থাকে। **ঘাসফড়িংয়ের রক্তকণিকায় কোনো শ্বসন রঞ্জক থাকে না।**

অ্যালারি পেশির সংকোচনের ফলে রক্ত পেরিকার্ডিয়াল সাইনাস থেকে অস্টিয়ার মাধ্যমে হৃৎযন্ত্রে প্রবেশ করে। পরে হৃৎযন্ত্র পর্যায়ক্রমে পিছন দিক থেকে সামনের দিকে সংকুচিত হওয়ায় রক্ত সম্মুখে প্রবাহিত হয় এবং অ্যাওর্টার ভিতর দিয়ে হিমোসিলে পৌছে। অস্টিয়ায় কপাটিকা থাকায় রক্ত হৃৎযন্ত্র থেকে বাইরে আসতে পারে না। একইভাবে হৃৎযন্ত্রের প্রকোষ্ঠসমূহের সংযোগস্থলে কপাটিকা থাকায় রক্ত পিছনের দিকে প্রবাহিত হতে পারে না। রক্ত প্রথমে মস্তকে প্রবেশ করে এবং ধীরে ধীরে পিছন দিকে প্রবাহিত হয়। হৃৎযন্ত্র যখন আবার প্রসারিত হয় তখন হিমোসিল হতে পেরিকার্ডিয়ামের প্রাচীরের ছিদ্রপথে রক্ত পেরিকার্ডিয়াল সাইনাসে ফিরে আসে।

ঘাসফড়িং-এর সমগ্রদেহে একবার রক্তপ্রবাহ সম্পন্ন হতে ৩০ থেকে ৬০ মিনিট সময় লাগে।

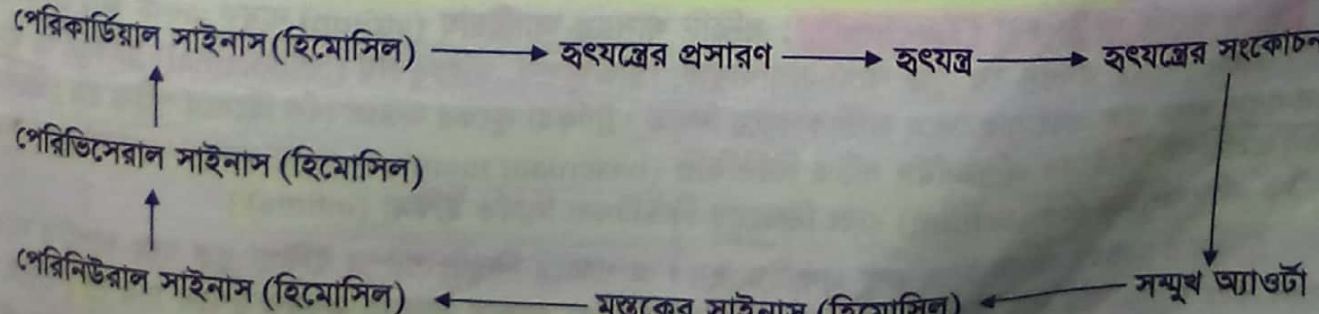

চিত্র ২.২.১৭ : ঘাসফড়িং-এর রক্ত প্রবাহের গতিপথ

সিলোম ও হিমোসিলের তুলনা

- পেরিকার্ডিয়ামে আবৃত ও মেসোডার্মাল সিলোমিক তরলপূর্ণ গহ্বরকে সিলোম বলে। অন্যদিকে, প্রথমে মেসোডার্মাল পেরি আবৃত থাকলেও পরে ব্লাস্টোসিরের সাথে একীভূত হয়ে গহ্বরটি বহিঃকোষীয় মাতৃকায় আবৃত হয় এবং রক্ত বহন ক হিমোসিল বলে।
- সিলোম দেহের কোন অঙ্গ বা উপাঙ্গে প্রসারিত হয় না কিন্তু হিমোসিল দেহের সকল উপাঙ্গে প্রসারিত হয়।
- সিলোম রক্ত সংবহনতন্ত্রের অংশ গঠন করে না । অপরদিকে হিমোসিল রক্ত সংবহনতন্ত্রের অংশ গঠন করে।
- সিলোমে পুষ্টি পদার্থ পরিবাহিত হয় না কিন্তু হিমোসিলে পুষ্টি পদার্থ পরিবাহিত হয়।
- অ্যানেলিডাসহ কর্ডাটা পর্বের প্রাণীতে সিলোম পাওয়া যায়। আর্থ্রোপোডা ও মোলাস্কা পর্বের প্রাণীতে হিমোসিল থাকে।

ঘাসফড়িং-এর শ্বসনতন্ত্র (Respiratory system)

অন্যান্য স্থলচর পতঙ্গের মতো ঘাসফড়িংও শ্বসনের জন্য বাতাস থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে। এদের শ্বসন ধরনের, তাই রক্তের অক্সিজেন বহনে অক্ষমতার ঘাটতি অনেকখানি পূরণ হয়েছে। **ট্রাকিয়া** নামক এক ধর শ্বাসনালির শাখা-প্রশাখার মাধ্যমে পরিবেশ থেকে গৃহীত অক্সিজেন সরাসরি দেহকোষে প্রবেশ করে এবং উৎপন্ন কার্বন ডাইঅক্সাইড একই পথে দেহনির্গত হয়। শ্বসন সম্পাদনের জন্য ট্রাকিয়া ও এর শাখা-প্র পরস্পরের সাথে মিলিত হয়ে ঘাসফড়িং-এ যে বিশেষ ধরনের শ্বসনতন্ত্র সৃষ্টি করেছে, তার নাম **ট্রাকিয়ালতন্ত্র** (t system)। ঘাসফড়িং-এর ট্রাকিয়ালতন্ত্র (শ্বসনতন্ত্র) নিচে বর্ণিত অঙ্গগুলো নিয়ে গঠিত।

১. শ্বাসরন্ধ্র বা স্পাইরাকল (Spiracle) : এগুলো ট্রাকিয়ালতন্ত্রের উন্মুক্ত ছিদ্রপথ। ঘাসফড়িং-এর দে পাশে মোট **দশজোড়া** শ্বাসরন্ধ্র রয়েছে। এর মধ্যে দুজোড়া বক্ষীয় অঞ্চলে এবং আটজোড়া উদরীয় অঞ্চলে প্রতিটি শ্বাসরন্ধ্র ডিম্বাকার ছিদ্রবিশেষ। এগুলো **পেরিট্রিম** (peritreme) নামক কাইটিন নির্মিত বেড় দিয়ে থাকে। রন্ধ্রগুলোর মুখে সূক্ষ্ম রোমযুক্ত **ছাঁকনি যন্ত্র** থাকায় ধূলাবালি, জীবাণু, পানি ইত্যাদি ভিতরে প্রবেশ ক না। পেশি নিয়ন্ত্রিত কপাটিকার সাহায্যে রন্ধ্রগুলো খোলে বা বন্ধ হয়। শ্বাসরন্ধ্র বন্ধ থাকলে দেহ থেকে জ বেরোতে পারে না।

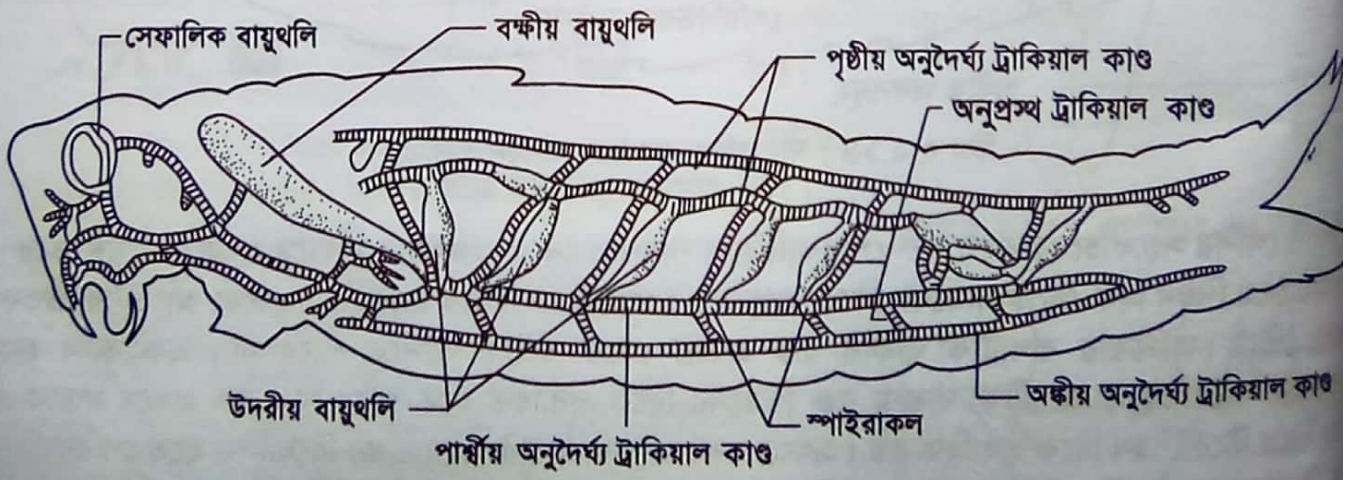

চিত্র ২.২.১৮ : ঘাসফড়িং-এর শ্বসনতন্ত্র (পার্শ্ব দৃশ্য)

২. শ্বাসনালি বা ট্রাকিয়া (Tracheae) : প্রতিটি শ্বাসরন্ধ্র **অ্যাট্রিয়াম** (atrium) নামক একটি ক্ষুদ্র প্রকো হয়। এখান থেকেই উৎপন্ন হয় সূক্ষ্ম শাখা-প্রশাখাযুক্ত, স্থিতিস্থাপক, বহিঃত্বকীয় (ectodermal) ট্রাকিয়া যা ঘ এর প্রধান শ্বসন অঙ্গ এবং সারাদেহে জালিকাকারে বিস্তৃত। ট্রাকিয়া ত্বকের অন্তঃপ্রবর্ধক হিসেবে গঠিত হয়। এদে তিন স্তরবিশিষ্ট। বাইরের এপিডার্মিস গঠিত **ভিত্তিঝিল্লি** (basement membrane), মাঝখানে চাপা বহুভূজাকা গঠিত **এপিথেলিয়াম** (epithelium) এবং ভিতরের কিউটিকল নির্মিত **ইন্টিমা** (intima)।

ট্রাকিয়ার অন্তঃস্থ গহ্বর দিয়ে বায়ু প্রবাহিত হয়। এ গহ্বরে কিছুটা পরপর ইন্টিমা পুরু হয়ে আংটির মত গঠন করে। এগুলোর নাম **টিনিডিয়া** (ctenidia)। টিনিডিয়া থাকায় ট্রাকিয়া কখনও চুপসে যায় না। দেহে জালিকাকারে বিন্যস্ত থাকলেও এদের মধ্যে প্রধান কতগুলো নালি অনুদৈর্ঘ্য ও অনুপ্রস্থভাবে বিন্যস্ত থাকে।

ট্রাকিয়াল কাণ্ড (tracheal trunk) বলে। মোট তিনজোড়া অনুদৈর্ঘ্য ট্রাকিয়াল কাণ্ড দেহের দৈর্ঘ্য বরাবর বিস্তৃত থাকে। যেমন–

- একজোড়া পার্শ্বীয় অনুদৈর্ঘ্য ট্রাকিয়াল কাণ্ড (lateral longitudinal tracheal trunk),
- একজোড়া পৃষ্ঠীয় অনুদৈর্ঘ্য ট্রাকিয়াল কাণ্ড (dorsal longitudinal tracheal trunk) এবং
- একজোড়া অঙ্কীয় অনুদৈর্ঘ্য ট্রাকিয়াল কাণ্ড (ventral longitudinal tracheal trunk)।

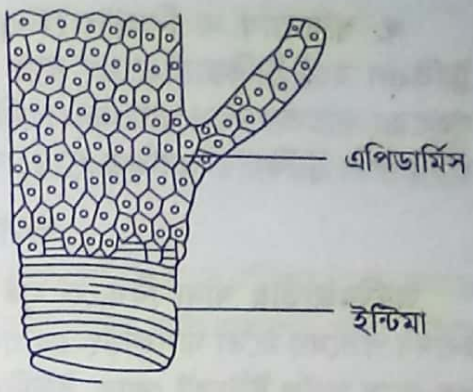

চিত্র ২.২.১৯ : ট্রাকিয়ার অংশবিশেষ বিবর্ধিত

দেহের প্রতিপাশে অবস্থিত পার্শ্বীয় ট্রাকিয়াল কাণ্ড থেকে পৃষ্ঠীয় ও অঙ্কীয়দিকে কতগুলো **অনুপ্রস্থ ট্রাকিয়াল কাণ্ড** (transeverse tracheal trunk) সৃষ্টি হয়ে যথাক্রমে পৃষ্ঠীয় ও অঙ্কীয় ট্রাকিয়াল কাণ্ডকে যুক্ত করে। ট্রাকিয়া সমগ্র দেহে শ্বসনিক গ্যাস পরিবহন করে।

৩. **ট্রাকিওল** (Tracheole) : ট্রাকিয়া থেকে ট্রাকিওল নামে সূক্ষ্ম শাখা সৃষ্টি হয়। এগুলো এককোষী নালিকা, মাত্র ১μm ব্যাসবিশিষ্ট, প্রাচীর ইন্টিমা ও টিনিডিয়াবিহীন কিন্তু এগুলোর অভ্যন্তর টিস্যুরসে পূর্ণ থাকে। এ টিস্যুরসই অন্যান্য প্রাণীর রক্তের মতো শ্বসনে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখে। এ রসের মাধ্যমে দেহকোষে গ্যাসীয় আদান-প্রদান ঘটে।

৪. **বায়ুথলি** (Air sac) : ট্রাকিয়ার কিছু শাখা প্রসারিত হয়ে বড়, ইন্টিমাবিহীন ও পাতলা প্রাচীরযুক্ত বায়ুথলি গঠন করে। এসব থলিতে বাতাস জমা থাকে এবং শ্বসনের সময় বায়ু প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে।

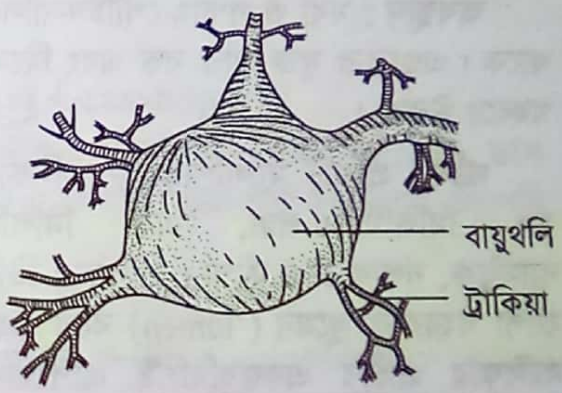

চিত্র ২.২.২০ : একটি বায়ুথলি

শ্বসন পদ্ধতি (Process of Respiration)

শ্বাসরঞ্জক না থাকায় ঘাসফড়িং-এর রক্ত শ্বসনে তেমন ভূমিকা পালন করতে পারে না। দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে জালিকার মতো ছড়িয়ে থাকা ট্রাকিয়া ও ট্রাকিওলের মাধ্যমে গ্যাসীয় বিনিময় ঘটে। শ্বাসগ্রহণ ও শ্বাসত্যাগ উভয় প্রক্রিয়া প্রধানত শ্বাসরন্ধ্র দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়। পেশির কার্যকারিতায় উদরের ছন্দময় সংকোচন-প্রসারণের ফলে বায়ু (O_2) দেহে প্রবেশ করে এবং ট্রাকিয়ালতন্ত্র থেকে বায়ু (CO_2) বেরিয়ে আসে।

ক. শ্বাসগ্রহণ বা প্রশ্বাস (Inspiration) : পেশির প্রসারণে উদরীয় খণ্ডকগুলো প্রসারিত হলে ট্রাকিয়ার অন্তঃস্থ গহ্বরও আয়তনে বৃদ্ধি পায়। এ সময় প্রথম চারজোড়া শ্বাসরন্ধ্র অর্থাৎ **প্রশ্বাসী শ্বাসরন্ধ্র**গুলো (inhalatory spiracle) খুলে যায় ফলে O_2-যুক্ত বায়ু প্রথমে শ্বাসরন্ধ্রের মাধ্যমে ট্রাকিয়ায় পৌঁছে, পরে সেখান থেকে ট্রাকিওল (টিস্যুরসে দ্রবীভূত হয়) ও বায়ুথলির মাধ্যমে অন্তঃকোষীয় স্থানে পৌঁছায়।

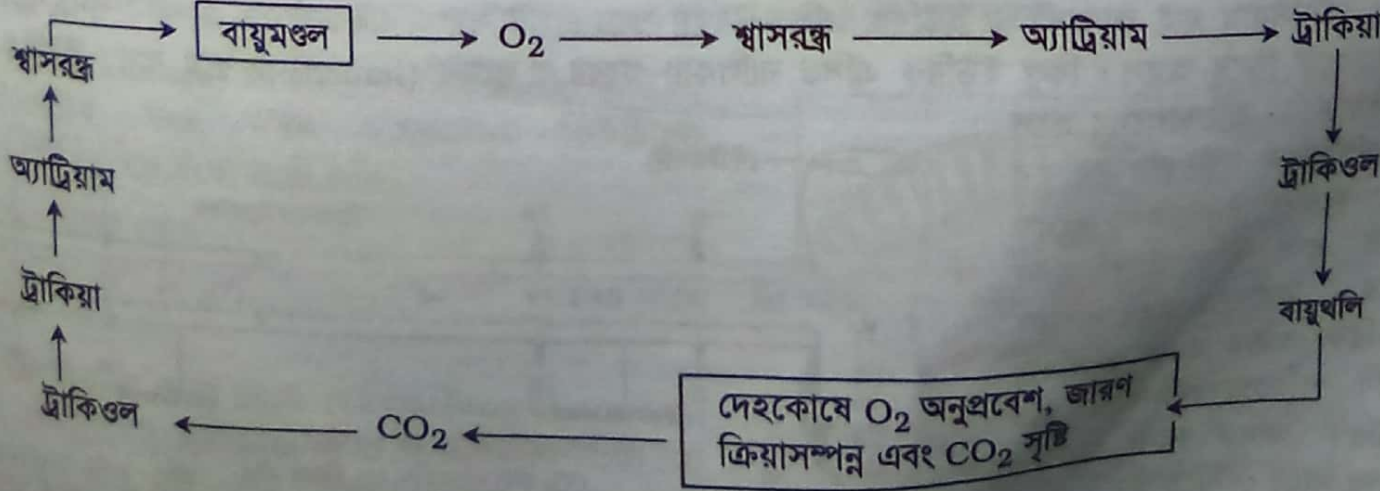

চিত্র ২.২.২১ : শ্বসনের গতিপথের রেখাচিত্র

খ. শ্বাসত্যাগ বা **নিঃশ্বাস** (Expiration) : দেহকোষে বিপাকের ফলে সৃষ্ট CO_2 ব্যাপন প্রক্রিয়ায় ব্য ট্রাকিওল হয়ে ট্রাকিয়ায় প্রবেশ করে। এসময় পেশির সংকোচনে উদরীয় খণ্ডকগুলো সংকুচিত হলে ট্রাকিয়া গহ্বরের আয়তন কমে যায় এবং বাকি ছয়জোড়া শ্বাসরন্ধ্র অর্থাৎ **নিঃশ্বাসী শ্বাসরন্ধ্র**গুলো (exhalatory spirac যায়। ফলে ট্রাকিয়ায় অবস্থিত CO_2 সজোরে শ্বাসরন্ধ্র পথে বাইরে নির্গত হয়।

ঘাসফড়িং-এর রেচন তন্ত্র (Excretory System)

আমিষজাতীয় খাদ্য বিপাকে সৃষ্ট নাইট্রোজেনঘটিত বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশনের প্রক্রিয়াকে রেচন (excretion অন্যসব পতঙ্গের মতো ঘাসফড়িং-এর প্রধান রেচন অঙ্গও **ম্যালপিজিয়ান নালিকা** (malpighian tubule)। তবে কিছু কোষ অর্থাৎ **ইউরেট কোষ, ইউরিকোজ গ্রন্থি, নেফ্রোসাইট** এবং **কিউটিকল** অতিরিক্ত রেচন অঙ্গ হিসেবে কা

ম্যালপিজিয়ান নালিকা

নামকরণ : Marcello Malpighi (1628–1694) নামক এক ইতালীয় চিকিৎসক ও জীববিজ্ঞানী সর্বপ্রথম সালে এ নালিকা আবিষ্কার করলে তাঁর নামানুসারে এর নামকরণ করা হয়।

অবস্থান : মধ্য ও পশ্চাৎ-পৌষ্টিকনালির সংযোগস্থলে অসংখ্য সুতার মতো **ম্যালপিজিয়ান নালিকা** হিমোসিলে থাকে। এগুলোর মুক্ত প্রান্ত বদ্ধ এবং হিমোসিল গহ্বরে হিমোলিম্ফের মধ্যে নিমজ্জিত থাকে। অন্যপ্রান্ত পৌষ্টি গহ্বরে উন্মুক্ত।

গঠন : প্রতিটি ম্যালপিজিয়ান নালিকা প্রায় ২৫ মিলিমিটার লম্বা, এক মিলিমিটার ব্যাসযুক্ত, নলাকার ও ফাঁপা। নালিকার ভিতরের ফাঁপা গহ্বরকে **লুমেন** (lumen) বলে। প্রতিটি নালিকার প্রাচীর একস্তরবিশিষ্ট এপিথেলিয়াম কোষে গঠিত। কোষস্তরের বাইরের দিক একটি **বেসমেন্ট পর্দা** (basement membrane)-য় এবং ভিতরের দিক অসংখ্য **মাইক্রোভিলাই** (microvilli) দিয়ে আবৃত। মাইক্রোভিলাই সম্মিলিতভাবে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ **ব্রাশ বর্ডার** (brush border) গঠন করে। নালিকাগুলো নিজে ততটা নড়নক্ষম নয় বরং হিমোসিলে হিমোলিম্ফের আন্দোলনে এগুলো রেচন সম্পন্ন করে।

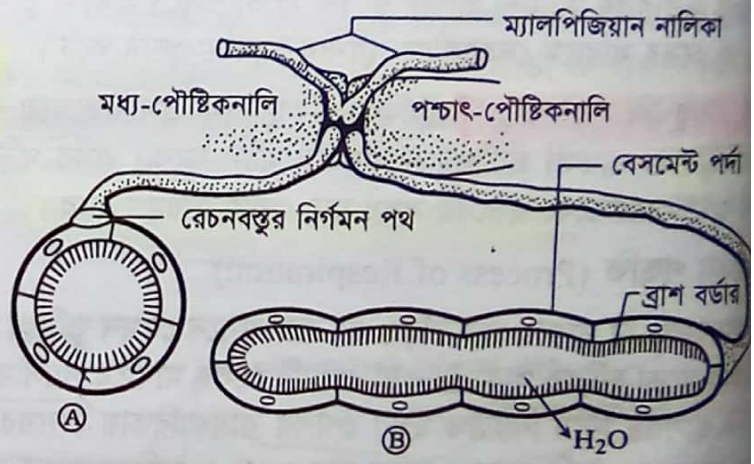

চিত্র ২.২.২২ : ম্যালপিজিয়ান নালিকার গঠন; Ⓐ প্রস্থচ্ছেদ এবং Ⓑ

রেচন প্রক্রিয়া : ম্যালপিজিয়ান নালিকার বদ্ধ প্রান্ত হিমোলিম্ফে ভাসমান অবস্থায় থেকে রক্ত থেকে পানি ও ডাইঅক্সাইড শোষণ করে। পরে পটাসিয়াম ইউরেট নালিকার কোষের মধ্যে পানি ও কার্বন ডাইঅক্সাইডের সাথে বি করে, পটাসিয়াম বাই-কার্বনেট ও ইউরিক এসিড উৎপন্ন করে। পটাসিয়াম বাইকার্বনেট ও পানি পুনঃশোষিত হিমোলিম্ফে ফিরে আসে। কিন্তু ইউরিক এসিড নালিকার গহ্বর বা **লুমেন** (lumen)-এ রয়ে যায়। ইউরিক এ সিলিয়ার আন্দোলনের ফলে ম্যালপিজিয়ান নালিকার গোড়ার অংশ হয়ে পৌষ্টিকনালিতে প্রবেশ করে এবং পশ্চাৎঅন্ত্রে গমন করে। মলাশয়ে অবস্থানকালে ইউরিক এসিড থেকে অতিরিক্ত পানি পরিশোষণের ফলে শুষ্ক ইউরিক এসিড দানা হিসেবে মলের সাথে বেরিয়ে যায়।

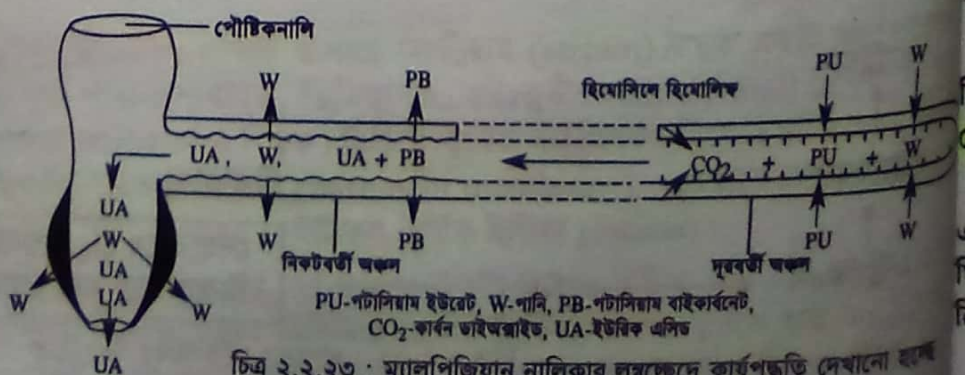

চিত্র ২.২.২৩ : ম্যালপিজিয়ান নালিকার লম্বচ্ছেদে কার্যপদ্ধতি দেখানো হচ্ছে

অতিরিক্ত বা আনুষাঙ্গিক রেচন অঙ্গ (Accessory Excretory Organ)

i. **ইউরেট কোষ** (Urate cell) : ঘাসফড়িং-এর দেহে অসংখ্য ফ্যাট বডি বা চর্বিকোষ থাকে। এগুলো ধানত শর্করা, আমিষ ও স্নেহ জাতীয় খাদ্যকে পরিবর্তিতরূপে জমা রাখে। তাছাড়া এগুলো হিমোলিম্ফে বিদ্যমান কিছু উরিক এসিড ও ইউরেট কোষের মধ্যেই আজীবন জমা করে রাখে। এসব পদার্থ সঞ্চয়ের কারণে কোষগুলো **ইউরেট ষ** নামে পরিচিত।

ii. **ইউরিকোজ গ্রন্থি** (Uricose glands) : পুরুষ ঘাসফড়িংয়ের মাশরুম গ্রন্থিতে ইউরিকোজ গ্রন্থি অবস্থান করায় মোসিল থেকে রেচন দ্রব্য শোষণ করে ইউরিক এসিডরূপে জমা করে। সংগমের সময় এসব বর্জ্য শুক্রাণুর সাথে বাইরে ক্ষিপ্ত হয়।

iii. **নেফ্রোসাইট** (Nephrocyte) : পেরিকার্ডিয়াল সাইনাসে হৃৎযন্ত্রের পার্শ্বদেশে অবস্থিত নেফ্রোসাইট রেচন দ্রব্য গ্রহ করে রক্তের মাধ্যমে নিষ্কাশন করে।

iv. **কিউটিকল** (Cuticle) : নিম্ফ দশায় হিমোসিলে ভাসমান অ্যামিবা সদৃশ কিছু **অ্যামিবোসাইট** (amoebocyte) ষ রক্ত থেকে রেচন দ্রব্য সংগ্রহ করে কিউটিকলের নিচে সঞ্চয় করে। খোলস মোচনের সময় পুরাতন কিউটিকলসহ ঞ্চিত রেচন দ্রব্য পরিত্যক্ত হয়।

ঘাসফড়িং-এর সংবেদী অঙ্গ (Sensory organs of Grasshopper)

যেসব গ্রাহক অঙ্গের মাধ্যমে প্রাণিদেহে পরিবেশ থেকে আগত বিশেষ উদ্দীপনা (স্পর্শ, ঘ্রাণ, স্বাদ, শব্দ, চাপ, তাপ আলোর তীব্রতা ইত্যাদি) গৃহীত হয়ে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে প্রেরিত হয় এবং উপযুক্ত প্রতিবেদন সৃষ্টি হয় তাকে সংবেদী ঙ্গ বা জ্ঞানেন্দ্রিয় বলে। ঘাসফড়িংয়ে নিম্নলিখিত সংবেদী অঙ্গ দেখা যায় –

১. **আলোকসংবেদী অঙ্গ** (Photoreceptors) : মস্তকে বিদ্যমান পুঞ্জাক্ষি ও ওসেলি।
২. **স্পর্শ সংবেদী অঙ্গ** (Thigmorecetpors) : দেহের বিভিন্ন অঙ্গের ব্রিসল ও রোম।
৩. **গন্ধ সংবেদী অঙ্গ** (Olfactoryreceptors) : অ্যান্টেনার রোম।
৪. **স্বাদ সংবেদী অঙ্গ** (Gastatoreceptors) : ম্যাক্সিলারি পাল্প ও ল্যাবিয়ামের রোম।
৫. **তাপ সংবেদী অঙ্গ** (Thermoreceptors) : পায়ের প্রথম তিনটি টার্সাসের গোড়ায় বিদ্যমান প্লান্টুলি প্যাড এবং অ্যান্টেনার কিছু রোম।
৬. **শ্রবণ সংবেদী অঙ্গ** (Chordotonalreceptors) : পায়ু সারকির রোম।

ঘাসফড়িং-এর পুঞ্জাক্ষি (Compound Eye) — গঠন ও দর্শন কৌশল

ঘাসফড়িংয়ের মাথার পৃষ্ঠভাগের উভয় পাশে অবস্থিত বড়, বৃন্তহীন, বৃক্কাকার, উত্তল, কালো অংশকে **পুঞ্জাক্ষি** বলে। ত্যেক পুঞ্জাক্ষি প্রায় দুহাজার (প্রজাতিভেদে সংখ্যা বিভিন্ন) ষড়ভূজাকার **ওমাটিডিয়া** (ommatidia) নিয়ে গঠিত। তিটি ওমাটিডিয়াম (একবচনে) একেকটি দর্শন একক হিসেবে কাজ করে। সমগ্র পুঞ্জাক্ষির উপরিভাগ স্বচ্ছ **কিউটিকল** uticle)-এ আবৃত থাকে। পুঞ্জাক্ষিতে অবস্থিত প্রতিটি ওমাটিডিয়ামের গঠন ও কার্যপদ্ধতি অভিন্ন ধরনের। নিচে একটি মাটিডিয়ামের গঠন ও এর বিভিন্ন অংশের কাজ উল্লেখ করা হলো। ১০টি অংশ

১. **কর্নিয়া** (Cornea) : এটি ওমাটিডিয়ামের বাইরের দকের বর্ণহীন, স্বচ্ছ, উত্তল ও ছয়কোণা কিউটিকল াবরণী। এটি লেন্সের মতো কাজ করে।

২. **কর্নিয়াজেন কোষ** (Corneagen cell) : এরা কর্নিয়ার চে একজোড়া চাপা ও পাশাপাশি অবস্থিত কোষ। এদের ক্ষরণ থেকে কর্নিয়া সৃষ্টি হয়।

৩. **ক্রিস্টালাইন কোণ কোষ** (Crystalline cone cell): গুলো কর্নিয়াজেন কোষের নিচে ক্রিস্টালাইন কোণকে রে অবস্থিত দীর্ঘ ৪টি কোষ। এসব কোষের ক্ষরণ থেকে ক্রিস্টালাইন কোণ গঠিত হয়।

চিত্র ২.২.২৪ : পুঞ্জাক্ষি (আংশিক ব্যবচ্ছেদকৃত)

৪. **ক্রিস্টালাইন কোণ** (Crystalline cone) : এটি কোণ কোষে পরিবেষ্টিত এবং এগুলোর মধ্যবর্তীস্থানে একটি স্বচ্ছ, মোচাকৃতি অঙ্গ। কোণ কোষ থেকে নিঃসৃত পদার্থে ক্রিস্টালাইন কোণ গঠিত হয়। এটি প্রতিসরণ হিসেবে কাজ করে ওমাটিডিয়ামে আলো প্রবেশে সাহায্য করে।

৫. **আইরিশ রঞ্জক আবরণী** (Iris pigment sheath) : এগুলো দীর্ঘ রঙীন (কালো কণিকা বহনকারী) কোণ কোষগুলোকে ঘিরে রাখে। তীব্র আলোতে এ আবরণ প্রসারিত হয়ে কোণ কোষগুলোকে সম্পূর্ণরূপে আবৃ আবার মৃদু আলোকে সংকুচিত হয়ে আংশিক উন্মুক্ত রাখে।

৬. **রেটিনুলার কোষ** (Retinular cell) : কোণ কোষগুলোর নিচে বৃত্তাকারে ৭/৮টি লম্বা রেটিনুলার কোষ অবস্থিত। এগুলোর নিউক্লিয়াস কোণ কোষ সংলগ্ন প্রান্তে অবস্থিত। এসব কোষ একদিকে কোণ কোষের সাথে অন্যদিকে স্নায়ুতন্তুর সাথে যুক্ত। এসব কোষের ক্ষরণ থেকে র‍্যাবডোম গঠিত। তাছাড়া এগুলো আলোক সংবেদীও বটে।

৭. **র‍্যাবডোম** (Rhabdome) : ক্রিস্টালাইন কোণের নিচে অবস্থিত স্বচ্ছ প্রলম্বিত এ অংশটি অনুপ্রস্থভাবে রেখান্বিত। একে ঘিরে অবস্থিত রেটিনুলার কোষগুলোর ক্ষরণ থেকেই র‍্যাবডোম গঠিত ও পুষ্ট হয়। এর মাধ্যমে আলো গৃহীত হয়। প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হয়।

৮. **রেটিনাল রঞ্জক আবরণী** (Retinal pigment sheath) : এটি রেটিনুলার কোষকে ঘিরে রঞ্জকময় কোষে গঠিত কালো পর্দার একটি আবরণ। এটি প্রত্যেক ওমাটিডিয়ামকে পরস্পর থেকে পৃথক করে রাখে। এ পর্দার রঞ্জক পদার্থ আলোর তীব্রতার উপর নির্ভর করে বিভিন্ন দিকে সঞ্চালিত হতে পারে।

৯. **ভিত্তিপর্দা** (Basal membrane) : ওমাটিডিয়াম যে পাতলা পর্দার উপর অবস্থান করে তার নাম ভিত্তিপর্দা। এটি ওমাটিডিয়ামকে ধারণ করে।

১০. **স্নায়ুতন্তু** (Nerve fibre) : প্রতিটি রেটিনুলার কোষ থেকে স্নায়ুতন্তু বেরিয়ে অপটিক স্নায়ুর সাথে যুক্ত হয়। এসব তন্তু ওমাটিডিয়ার মাধ্যমে গৃহীত প্রতিবিম্ব মস্তিষ্কে প্রেরণ করে।

চিত্র ২.২.২৫ : একটি ওমাটিডিয়াম (লম্বচ্ছে

পুঞ্জাক্ষি (জটিল চোখ) এবং সরলাক্ষি (সরল চোখ)-র মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	পুঞ্জাক্ষি	সরলাক্ষি
১. অবস্থান	আর্থ্রোপোডদের মাথার পৃষ্ঠ বা পার্শ্ব দিকে।	মেরুদন্ডী প্রাণিদের মাথার দুপাশে, কোটরের ভি
২. গঠন	গোল বা বৃক্কাকার, অসংখ্য ওমাটিডিয়া একক নিয়ে গঠিত।	প্রায় গোল, সরলাক্ষি নিজেই একটি একক।
৩. এককের উপাদান	কর্নিয়া, কর্নিয়াজেন কোষ, কোণ কোষ, ক্রিস্টালাইন কোণ, আইরিশ আবরণী, রেটিনাল আবরণী, র‍্যাবডোম ইত্যাদি।	কর্নিয়া, আইরিশ, লেন্স, রেটিনা, কোরয়েড, স্ক্লেরা, প্রকোষ্ঠ ইত্যাদি।
৪. আইরিশ আবরণী	অসংখ্য ও লম্বা।	একটি এবং গোল।
৫. স্ক্লেরা ও কোরয়েড	অনুপস্থিত।	উপস্থিত।
৬. প্রতিবিম্ব	মৃদু আলো ও উজ্জ্বল আলোতে ভিন্ন ধরনের প্রতিবিম্ব গঠিত হয়।	সবক্ষেত্রে একই ধরনের প্রতিবিম্ব গঠিত হয়।

দর্শন কৌশল (Mechanism of Vision)

প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করে প্রাণী বস্তুকে অবলোকন করে। ঘাসফড়িং **দিবাচর শস্যভোজী** প্রাণী। দিনের **উজ্জ্বল** (তীব্র) ও দিনের শেষে **স্তিমিত** (মৃদু) আলো– দুসময়েই এদের দৃষ্টিশক্তি কার্যকর থাকে। এজন্য দুটো ভিন্ন দর্শন কৌশল র এরা মানুষের চেয়ে স্পষ্টভাবে কোনো চলমান বস্তু দেখতে পারে। সাধারণত ঘাসফড়িং একটি ওমাটিডিয়াম দিয়ে বস্তুকে দেখতে পায়না। প্রতিটি ওমাটিডিয়ামে বস্তুর খণ্ডিত প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হয়। সকল ওমাটিডিয়ামের স

প্রতিবিম্ব বস্তুটিকে সম্পূর্ণরূপে দেখতে সাহায্য করে। সম্পূর্ণভাবে গঠিত প্রতিবিম্বের সংবেদন **অপটিক স্নায়ু** (optic nerve)-র মাধ্যমে মস্তিষ্কে পৌঁছালে ঘাসফড়িং তা দেখতে পায়। **আলোর তীব্রতা অনুসারে পুঞ্জাক্ষিতে দুধরনের প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হয়, যথা–মোজাইক প্রতিবিম্ব** এবং **সুপারপজিশন প্রতিবিম্ব।**

১. উজ্জ্বল আলোতে মোজাইক বা অ্যাপোজিশন প্রতিবিম্ব (Mosaic or Apposition Image)

দিনে উজ্জ্বল বা তীব্র আলোতে ঘাসফড়িং-এর ওমাটিয়ামে **মোজাইক প্রতিবিম্ব** সৃষ্টি হয় এবং এতে প্রত্যেক ওমাটিডিয়াম স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে। উজ্জ্বল আলোতে আইরিশ রঞ্জক আবরণী ও রেটিনাল রঞ্জক আবরণী অবিচ্ছিন্নভাবে প্রসারিত হয়ে কর্নিয়াজেন কোষ ও ক্রিস্টালাইন কোণ কোষগুলোকে সম্পূর্ণরূপে আবৃত করে। ফলে প্রতিটি ওমাটিডিয়াম পরস্পর থেকে পৃথক হয়ে যায়। এ অবস্থায় দর্শনীয় বস্তুর কোন বিন্দু থেকে আগত কেবল লম্বভাবে পতিত আলোকরশ্মি ওমাটিডিয়ামে প্রবেশ করে এবং কর্নিয়া ও ক্রিস্টাইলাইন কোণ হয়ে র‍্যাবডোমে প্রবেশ করে। কিন্তু ঐ বিন্দু থেকে আগত তির্যক আলোকরশ্মি পার্শ্ববর্তী ওমাটিডিয়ামের কর্নিয়া ভেদ করলেও আইরিশ ও রেটিনাল অবিচ্ছিন্ন আবরণীতে শোষিত হয়। ফলে প্রতিটি ওমাটিডিয়ামে দর্শনীয় বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন অংশের পৃথক ও সুস্পষ্ট প্রতিবিম্ব গঠিত হয়। সকল ওমাটিডিয়ামের এসব খন্ডিত প্রতিবিম্ব একত্রিত হলে ঘাসফড়িং বস্তুটিকে স্পষ্ট দেখতে পায়। মোজাইকের মতো বিন্দু বিন্দু করে পুরো প্রতিবিম্বটি গঠিত হওয়ায় এধরনের প্রতিবিম্ব **মোজাইক প্রতিবিম্ব** এবং একটি একটি করে বহু প্রতিবিম্বের সমন্বয়ে পূর্ণাঙ্গ প্রতিবিম্ব তৈরি হওয়ায় এধরনের প্রতিবিম্বকে **অ্যাপোজিশন প্রতিবিম্ব** বলা হয়ে থাকে।

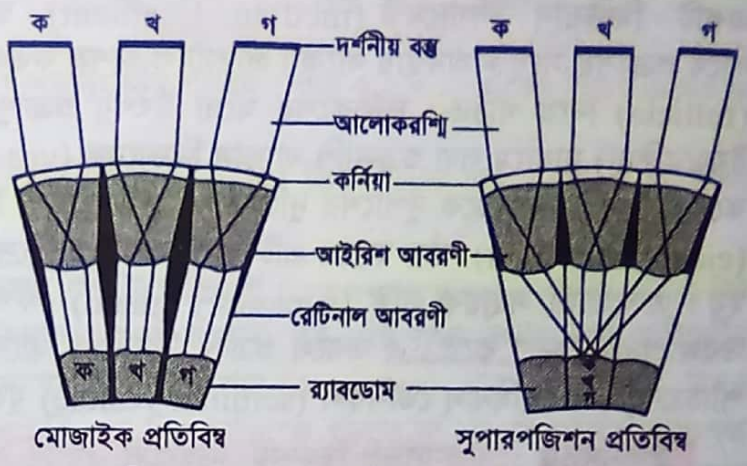

চিত্র ২.২.২৬ : ঘাসফড়িংয়ের দর্শন কৌশল

২. অনুজ্জ্বল বা স্তিমিত আলোতে সুপারপজিশন প্রতিবিম্ব (Superposition Image)

সাধারণত বিকেলে, সন্ধ্যায় বা রাতে অর্থাৎ অনুজ্জ্বল আলোতে ঘাসফড়িং-এর ওমাটিডিয়ামে **সুপারপজিশন প্রতিবিম্ব** সৃষ্টি হয়। অনুজ্জ্বল বা স্তিমিত আলোতে ওমাটিডিয়ামের আইরিশ রঞ্জক আবরণী কর্নিয়ার দিকে এবং রেটিনাল রঞ্জক আবরণী ভিত্তি পর্দার দিকে সংকুচিত হয়ে যায়। ফলে পুরো ওমাটিডিয়াম অর্থাৎ ক্রিস্টালাইন কোণ ও র‍্যাবডোম অনাবৃত হয়ে যায়। এসময় দর্শন বস্তু হতে সরাসরি আসা আলোকরশ্মি সোজাসুজি কর্নিয়া, ক্রিস্টালাইন কোণ হয়ে র‍্যাবডোমে পৌঁছায়। আবার দর্শন বস্তু থেকে তির্যকভাবে আসা আলোকরশ্মি একটি ওমাটিডিয়ামের কর্নিয়ার মাধ্যমে প্রবেশ করে পাশের ওমাটিডিয়ামের র‍্যাবডোমে এসে পড়ে। রঞ্জক আবরণীদুটির বাধা না থাকায় আলোকরশ্মির এধরনের চলাচল সম্ভব হয়। ফলে একটি ওমাটিডিয়ামে একাধিক দিক থেকে আসা আলোকরশ্মি দিয়ে একের উপর আরেকটি এভাবে একাধিক প্রতিবিম্ব পড়ে। ফলে সম্পূর্ণ বস্তুর একটি অস্পষ্ট ও ঝাপসা প্রতিবিম্ব তৈরি হয়। একটির উপর আরেকটি প্রতিবিম্ব পড়ার ফলে সম্পূর্ণ প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হওয়ায় এধরনের প্রতিবিম্বকে **সুপারপজিশন প্রতিবিম্ব** বলা হয়ে থাকে।

সুপারপজিশন প্রতিবিম্ব ও অ্যাপোজিশন প্রতিবিম্বের তুলনা

অনুজ্জ্বল বা স্তিমিত আলোয় সুপারপজিশন প্রতিবিম্ব গঠিত হয়। তীব্র বা উজ্জ্বল আলোয় অ্যাপোজিশন প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হয়।

সুপারপজিশন প্রতিবিম্বে রেটিনাল ও আইরিশ আবরণী সঙ্কুচিত হয়। অ্যাপোজিশন প্রতিবিম্বে এ দুটি আবরণী প্রসারিত হয়।

সুপারপজিশন প্রতিবিম্বে তির্যক ও উলম্বিক উভয় আলোকরশ্মি ওমাটিডিয়ামে প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করে। অ্যাপোজিশন প্রতিবিম্বে কেবল লম্বভাবে পতিত আলোকরশ্মি ওমাটিডিয়ামে প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করে।

সুপারপজিশন প্রতিবিম্বে বস্তুর সম্পূর্ণ অংশের অস্পষ্ট, সামগ্রিক ও ঝাপসা প্রতিবিম্ব গঠিত হয়। অ্যাপোজিশন প্রতিবিম্বে বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন অংশে পৃথক ও সুস্পষ্ট প্রতিবিম্ব গঠিত হয়।

ঘাসফড়িং-এর প্রজনন প্রক্রিয়া ও রূপান্তর (Process of Reproduction and Metamorp

প্রজননতন্ত্র (Reproductive System)

ঘাসফড়িং একলিঙ্গ প্রাণী। এদের যৌন দ্বিরূপতা সুস্পষ্ট। একটি পুরুষ ও স্ত্রী ঘাসফড়িং বাইরে থেকে সহজে চেনা যায়। স্ত্রী ফড়িং-এর উদরের **ওভিপজিটর** (ovipositor) দেখে পুরুষ সদস্য আলাদা ক নিচে ঘাসফড়িং-এর পুরুষ ও স্ত্রী জননতন্ত্র সম্বন্ধে আলাদাভাবে বর্ণনা করা হলো।

পুংজননতন্ত্র : ঘাসফড়িং-এর পুংজননতন্ত্র শুক্রাশয়, শুক্রনালি বা ভাস ডিফারেন্স, ক্ষেপন নালি, সেমিনাল ভেসিকল, লিঙ্গ প্রভৃতি সমন্বয়ে গঠিত। **শুক্রাশয়** (testis) পুংজননতন্ত্রের মুখ্য অঙ্গ। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম উদর খণ্ডকে অন্ত্রের উপরে একটি **মিডিয়ান লিগামেন্ট** (median ligament) দ্বারা পৃষ্ঠীয় প্রাচীরের সাথে শুক্রাশয় সংযুক্ত অবস্থায় থাকে। প্রতিটি শুক্রাশয় কতগুলো ক্ষুদ্র স্বচ্ছ **ফলিকল** (follicle) নিয়ে গঠিত। ফলিকলের মধ্যে উৎপন্ন শুক্রাণু সূক্ষ্ম নালিকার (ভাসা ইফারেন্সিয়া) মাধ্যমে লম্বা শুক্রনালি বা **ভাস ডিফারেন্স** (vas difference)-এ প্রবেশ করে। নবম উদর খণ্ডকে দুপাশের দুটি ভাসা ডিফারেন্সিয়া মিলিত হয়ে **ক্ষেপননালি** (ejaculatory duct) গঠন করে। এটি লিঙ্গে অবস্থিত ছিদ্রের মাধ্যমে বাইরে উন্মুক্ত হয়। একজোড়া **সহায়ক গ্রন্থি** (accessory gland) ক্ষেপন নালিতে উন্মুক্ত হয়ে তরল পদার্থ ক্ষরণ করে। এ তরলে শুক্রাণু নিমজ্জিত থাকে। সহায়ক গ্রন্থির সঙ্গে প্যাঁচানো, লম্বা **সেমিনাল ভেসিকল** (seminal vesicle) যুক্ত থাকে।

চিত্র ২.২.২৭ : পুংজনন

স্ত্রীজননতন্ত্র : স্ত্রীজননতন্ত্র ডিম্বাশয়, ডিম্বনালি, যোনি, স্পার্মাথিকা বা সেমিনাল রিসেপ্টেকল, স্ত্রীজননরন্ধ্র ও আনুষঙ্গিক গ্রন্থি নিয়ে গঠিত। দুটি **ডিম্বাশয়** (ovary) স্ত্রীজননতন্ত্রের মুখ্য অঙ্গ এবং অন্ত্রের উপরে **মিডিয়ান লিগামেন্ট** (median ligament) দ্বারা পৃষ্ঠীয় প্রাচীরের সাথে আটকানো থাকে। প্রতিটি ডিম্বাশয় নলের মতো অনেকগুলো অণুডিম্বাশয় বা **ওভারিওল** (ovarioles) নিয়ে গঠিত। অণুডিম্বাশয়গুলো একত্রে মিলিত হয়ে একটি চওড়া ডিম্বনালি গঠন করে। দুটি ডিম্বনালি একীভূত হয়ে **যোনি** (vagina) নামে একটি ছোট প্রকোষ্ঠ গঠন করে। যোনি দেহের ৭ম উদরীয় খন্ডে অবস্থিত একটি পেশিবহুল প্রকোষ্ঠ যা অভিপজিটরের দুটি অংশের মাঝে অবস্থিত। এটি ওভিপজিটর হয়ে জননছিদ্রের মাধ্যমে বাইরে উন্মুক্ত হয়। যোনিতে একজোড়া ডিম্বনালি ছাড়াও একটি কুন্ডলীকৃত স্পার্মাথিকাল নালি যুক্ত থাকে। এ কুন্ডলীকৃত নালির শেষ প্রান্তে একটি থলির মতো **স্পার্মাথিকা** (spermatheca) থাকে যা অল্প সময়ের জন্য শুক্রাণুকে স্ত্রীদেহে জমা করে রাখে। ডিম্বাশয়ের উপরিভাগে একজোড়া সহায়ক গ্রন্থি রয়েছে যা ডিম্বনালির মাধ্যমে যোনিতে এসে সংযুক্ত হয়। এ সহায়ক গ্রন্থি নিঃসৃত তরল দেহের বাইরে আসার আগে ডিমকে গুচ্ছবদ্ধ রাখতে সহায়তা করে।

চিত্র ২.২.২৮ : স্ত্রীজনন

প্রজনন প্রক্রিয়া (Process of Reproduction)

ঘাসফড়িং **যৌন** (sexual) প্রক্রিয়ায় প্রজনন ঘটায়। এর প্রজনন প্রক্রিয়া নিচে বর্ণিত কয়েকটি পর্যায়ে স

১. যৌনমিলন (Copulation): গ্রীষ্মের শেষদিকে ঘাসফড়িং-এর যৌনমিলন ঘটে। এ সময় পুরুষ-ফড়িং স্ত্রী এর পিঠে উঠে আটকে থাকে এবং এ অবস্থায় শিশ্নপথে স্ত্রী-ফড়িং-এর যোনিতে সেমিনাল ফ্লুইড ত্যাগ করে। ফ্লুইডে শুক্রাণু থাকে। ডিম না পাড়া পর্যন্ত শুক্রাণুগুলো স্পার্মাথিকায় জমা থাকে। ডিম পাড়ার আগে কয়েকবার হতে পারে।

২. নিষেক (Fertilization) : যৌন মিলনের এক পর্যায়ে পুরুষ-প্রাণিদেহ থেকে শুক্রাণু স্ত্রী-প্রাণিদেহে হয় এবং শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর নিউক্লিয়াসের পরস্পর একীভবনে নিষেক সম্পন্ন হয়। ঘাসফড়িং-এর নিষেক (internal)। ৩–৫ মিমি লম্বা ডিম্বাণুটি **কুসুম** (yolk) সমৃদ্ধ এবং ডিম্বনালি দিয়ে বেরিয়ে আসার সময় নরম

ঝিল্লি (vitelline membrane) ও শক্ত-নমনীয় বহিঃস্থ **কোরিওন** (chorion)-এ আবৃত হয়। স্পার্মাথিকা রন্ধ্রের উপর দিয়ে যাওয়ার সময় ডিম নিষিক্ত হয়। কোরিওনের একটি ক্ষুদ্র ছিদ্রপথে শুক্রাণু ডিম্বাণুতে প্রবেশ করে। এ ছিদ্রটিকে **মাইক্রোপাইল** (micropyle) বলে।

৩. ডিমপাড়া (Oviposition) : মিলনের পর থেকে কিছুদিন পর পর স্ত্রী ঘাসফড়িং লম্বা, বাদামি রংয়ের ডিম পাড়তে শুরু করে। শরৎকাল পর্যন্ত ডিমপাড়া অব্যাহত থাকে। স্ত্রী ফড়িং ওভিপজিটরের সাহায্যে ১০ সে.মি. গভীর একটি গর্ত করে এর ভেতরে গুচ্ছাকারে ২০টি ডিম পাড়ে। আঠালো পদার্থের সাহায্যে ডিমগুলো পরস্পরের সঙ্গে আটকে থাকে। একটি স্ত্রী-ফড়িং এভাবে ১০টি গুচ্ছে মোট ২০০টি ডিম পাড়ে। ডিম পাড়ার পর পুরুষ ও স্ত্রী উভয় ঘাসফড়িংই মারা যায়।

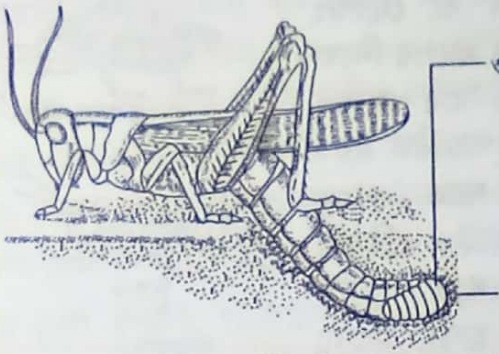

চিত্র ২.২.২৯ : ঘাসফড়িং ডিম পাড়ছে

চিত্র ২.২.৩০ : গর্তের ভিতর ডিমের গুচ্ছ

৪. পরিস্ফুটন (Development) : ঘাসফড়িং-এর ডিম্বাণু **সেন্ট্রোলেসিথাল** (centrolecithal) ধরনের অর্থাৎ এর কুসুম কেন্দ্রে সীমাবদ্ধ থাকে। নিষিক্ত ডিম্বাণুর ক্লিভেজ (বিভাজন) শুরু হওয়ার পর প্রায় তিন সপ্তাহ ধরে পরিস্ফুটন অব্যাহত থাকে। শীতকালে পরিস্ফুটন বন্ধ থাকে। এ সময়কালটি **ডায়াপজ** (diapause) নামে পরিচিত। তখন শীতকালীন প্রতিকূল অবস্থার (প্রচন্ড শীত ও খাদ্যাভাব) মুখোমুখি যেন শিশু ফড়িংকে পরতে না হয় সে কারণে ডায়াপজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বসন্তের আগমনে উষ্ণ পরিবেশ ফিরে এলে আবার বৃদ্ধি শুরু হয় এবং অতি ক্ষুদ্রাকায় শিশু ঘাসফড়িং-এর জন্ম হয়।

রূপান্তর (Metamorphosis)

পতঙ্গের ভ্রূণ যখন কয়েকটি ধারাবাহিক পরিবর্তনের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ দশা প্রাপ্ত হয় তখন এ ধরনের ভ্রূণোত্তর পরিস্ফুটনকে রূপান্তর বলে। রূপান্তর প্রধানত দুধরনের– ১। অসম্পূর্ণ ও ২। সম্পূর্ণ রূপান্তর।

১. অসম্পূর্ণ রূপান্তর (Incomplete metamorphosis) : যে রূপান্তরে একটি পতঙ্গ ডিম ফুটে বেরিয়ে কয়েকটি নিম্ফ (শিশু)দশা অতিক্রমের পর পূর্ণাঙ্গ পতঙ্গে পরিণত হয় তাকে অসম্পূর্ণ রূপান্তর বলে। প্রত্যেক নিম্ফ দশা দেখতে প্রায় পূর্ণাঙ্গ পতঙ্গের ক্ষুদ্র প্রতিরূপের মতো দেখায়, কিন্তু এগুলো ডানা ও জননাঙ্গবিহীন থাকে এবং স্পষ্ট বর্ণপার্থক্য প্রদর্শন করে। অসম্পূর্ণ রূপান্তরের শিশু অবস্থায় প্রাণীকে **নিম্ফ** (nymph) বলে। উদাহরণ– ঘাসফড়িং ও তেলাপোকার রূপান্তর।

২. সম্পূর্ণ রূপান্তর (Complete metamorphosis) ঃ যে রূপান্তরে শিশু প্রাণী ও পূর্ণাঙ্গ প্রাণীর মধ্যে কোনো আঙ্গিক মিল থাকে না এবং ব্যাপক পরিবর্তনের মাধ্যমে শিশুপ্রাণী পূর্ণাঙ্গ অবস্থাপ্রাপ্ত হয়, সে ধরনের রূপান্তরকে সম্পূর্ণ রূপান্তর বলে। এ ক্ষেত্রে রূপান্তরের ৪টি সুস্পষ্ট ধাপ হচ্ছেঃ ডিম→ লার্ভা→পিউপা →ইমোগো (পূর্ণাঙ্গ)। সম্পূর্ণ রূপান্তরে শিশু অবস্থায় প্রাণীকে **লার্ভা** (larva) বলে। উদাহরণ– মৌমাছি ও প্রজাপতির রূপান্তর ।

ঘাসফড়িং-এর রূপান্তর

ঘাসফড়িং-এর রূপান্তর **অসম্পূর্ণ** বা **হেমিমেটাবোলাস** (hemimetabolous) ধরনের কারণ এদের অপরিণত নিম্ফ আংশিক পরিস্ফুটনের মাধ্যমে কয়েকটি নিম্ফ দশা পেরিয়ে পূর্ণাঙ্গ ঘাসফড়িং-য়ে রূপান্তরিত হয়। অর্থাৎ ঘাসফড়িংয়ের জীবন ইতিহাসে তিনটি ধাপ রয়েছে: **ডিম → নিম্ফ → পূর্ণাঙ্গ প্রাণী**।

ডিম ফুটে যে তরুণ ঘাসফড়িং বেরিয়ে আসে তাকে **নিম্ফ** (nymph) বলে। বহির্গঠনের দিক থেকে নিম্ফ এবং পূর্ণাঙ্গ ঘাসফড়িং দেখতে প্রায় এক রকম, অন্ততঃ মুখোপাঙ্গ, সরলাক্ষি ও পুঞ্জাক্ষি, অ্যান্টেনি, পায়ু প্রভৃতি। অনুরূপভাবে, নিম্ফের জীবনধারণ, খাদ্যাভ্যাস, খাদ্য ও বসতিও এক রকম। নিম্ফ ও পূর্ণাঙ্গ ঘাসফড়িং-এ পার্থক্য হচ্ছেঃ নিম্ফে ডানা ও জননাঙ্গ থাকে না, তা ছাড়া দেহের আকার-আকৃতি ছোট থাকে। পূর্ণাঙ্গ হলে ডানা ও জননাঙ্গের পরিস্ফুটন ঘটে, দেহের আকারও বড় হয়।

সদ্য পরিস্ফুটিত নিম্ফের কাইটিন নির্মিত বহিঃকঙ্কাল থাকে স্বচ্ছ, ক্রমশ গাঢ় হয়। একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে নিম্ফ একটু বড় হলে বহিঃকঙ্কাল আঁটসাট হয়ে দেহবৃদ্ধি রহিত করে দেয়। তখন দেহবৃদ্ধি স্বাভাবিক রাখতে পুরনো বহিঃকঙ্কাল মোচন বা **মোল্টিং** (molting) প্রক্রিয়ায় ত্যাগ করে ২য় ধাপের নিম্ফে পরিণত হয়। পরবর্তীতে আরও ৩ বার খোলস মোচনের পর পূর্ণাঙ্গ ঘাসফড়িং-এ রূপান্তরিত হয়। দ্বিতীয় ধাপের নিম্ফে ক্ষুদ্রাকায় **ডানা প্যাড** (wing pad) থেকে ডানা সৃষ্টির সূত্রপাত ঘটে। প্রতিবার খোলস মোচনের পর নিম্ফ দেখতে পূর্ণাঙ্গ ঘাসফড়িং-এর মতো দেখায়। তা ছাড়া, এদের পরিস্ফুটনে কোনো বিশ্রাম দশাও নেই। পঞ্চম বার খোলস মোচনের মাধ্যমে নিম্ফ পরিণত ঘাসফড়িং হয়ে উঠে। দুটি মোচনের মধ্যবর্তী দশাকে **ইনস্টার** (instar) বলে। ঘাসফড়িং-এর রূপান্তর সম্পন্ন হতে প্রায় দুমাস সময় লাগে।

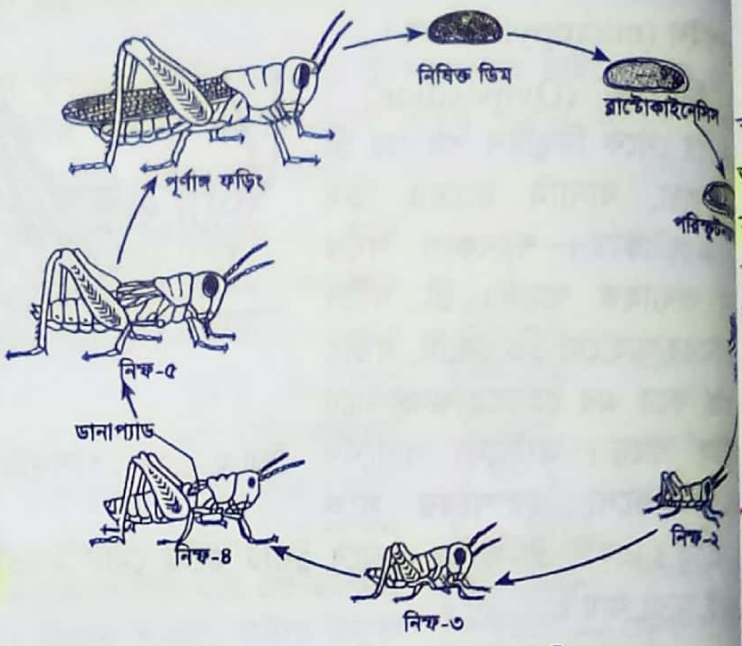

চিত্র ২.২.৩১ : ঘাসফড়িং-এর জীবনচক্র

রূপান্তরে হরমোনের ভূমিকা

ঘাসফড়িং-এর দেহে ৪ ধরনের অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি পাওয়া যায়- **ইন্টার সেরিব্রাল গ্রন্থি কোষ**, **প্রোথোরাসিক**, **করপোরা অ্যালাটা** এবং **করপোরা কার্ডিয়াকা**। এগুলোর মধ্যে প্রথম ৩টি গ্রন্থি নিঃসৃত হরমোন ঘাসফড়িং-এর রূ প্রধান ভূমিকা পালন করে। নিচে এদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো।

১. **ইন্টার সেরিব্রাল গ্রন্থি কোষ** (Inter cerebral gland cells) : মস্তিষ্কে অবস্থানকারী এ গ্রন্থিকো **প্রোথোরাসিকোট্রপিক হরমোন বা মস্তিষ্ক হরমোন** (Prothoracicotropic hormone or Brain hormone) নি করে যা প্রোথোরাসিক গ্রন্থিকে হরমোন নিঃসরণে উদ্দীপিত করে।

২. **প্রোথোরাসিক গ্রন্থি** (Prothoracic gland) : অগ্রবক্ষে অবস্থিত এ গ্রন্থিগুলো **একডাইসোন হ** (Ecdysone hormone) নিঃসরণ করে যা নিম্ফ দশায় নির্মোচন বা **মোল্টিং** (ecdysis or moulting) নিয়ন্ত্রণ ফলে দেহের টিস্যুর বৃদ্ধি ঘটতে থাকে।

৩. **করপোরা অ্যালাটা** (Corpora allata) : নিম্ফ দশায় এ গ্রন্থি **জুভেনাইল হরমোন** (Juvenile hormo neotinin) নিঃসরণ করে যা নিম্ফদশার বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে। প্রকৃতপক্ষে এ হরমোনের প্রভাবেই ঘাসফড়িং- এর দশা দীর্ঘ হয়। প্রাপ্তবয়স্কদের করপোরা অ্যালাটা থেকে **গোনাডোট্রপিক হরমোন** (Gonadotropic hormone) নি হয় যা প্রাপ্তবয়স্কদের জনন অঙ্গের পরিণতি ঘটায়।

৪. **করপোরা কার্ডিয়াকা** (Corpora cardiaca) : মস্তিষ্কের পশ্চাৎভাগে গ্রাসনালির দুপাশে অবস্থিত এ গ্রন্থি **গ্রোথ হরমোন** (Growth hormone) নিঃসরণ করে।

নিম্ফ ও পূর্ণাঙ্গ ঘাসফড়িং- এর মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	নিম্ফ (Nymph)	পূর্ণাঙ্গ ঘাসফড়িং (Adult Grasshopper)
১. দেহবর্ণ	বাদামি।	সবুজ।
২. আকার	নিম্ফ আকারে ছোট।	পূর্ণাঙ্গ ঘাসফড়িং আকারে বড়।
৩. পাখা	থাকে না।	থাকে।
৪. জননাঙ্গ	অপরিণত থাকে।	পরিণত থাকে।
৫. মোল্টিং	ঘটে।	ঘটে না।

২.৩ প্রতীক প্রাণী : রুই মাছ *(Labeo rohita)*

বাংলাদেশের তিনটি (রুই, কাতলা ও মৃগেল) বড় কার্প জাতীয় প্রজাতির মধ্যে **রুই মাছ** *(Labeo rohita)* স্বাদুপানির চাষযোগ্য, সুলভ, জনপ্রিয় ও প্রোটিনসমৃদ্ধ সুস্বাদু মাছ। এটি একটি দ্রুত বর্ধনশীল মাছ এবং স্বাভাবিক অবস্থায় খামারে বছরে ৩৫–৪৫ সেন্টিমিটার (১–১.৫ ফুট) লম্বা, ৭০০– ৮০০ গ্রাম ওজনবিশিষ্ট হয়। কিন্তু হালদা নদীর রুইয়ের পোনার বৃদ্ধি ২–২½ কেজি পর্যন্ত বাড়ে। একারণে হালদা নদীর রুইয়ের রেণু পোনা / ডিম পোনা (৪ দিনের বয়সের পোনা) প্রতি কেজি সর্বনিম্ন ৬০–৬৫ হাজার টাকা (যখন বিপুল পরিমাণ ডিম পাওয়া যায়), সর্বোচ্চ এক লক্ষ টাকা। শুধু বৃদ্ধি হারের জন্যই নয়, বিভিন্ন চাষ বা লালন কেন্দ্রগুলোতে অন্তঃপ্রজননের ফলে বামনত্ব, বিকলাঙ্গতাসহ বিভিন্ন জিনগত সমস্যা দেখা দেওয়ায় হালদা-র প্রাকৃতিক ও বিশুদ্ধ জিনের পোনা এখন আরও দুর্মূল্য হয়ে উঠেছে।

বসতি (Habitat) : রুই মাছ ইন্ডিয়া (মূল ভূখন্ড), পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও মায়ানমারের নদীতন্ত্রের প্রাকৃতিক প্রজাতি। স্বাদুপানির পুকুর, নদী, হ্রদ ও মোহনায় পাওয়া যায়। বাংলাদেশে বিভিন্ন বড় নদীতে বিচরণ করে, ডিম ছাড়ার সময় প্লাবনভূমিতে প্রবেশ করে। স্বাদ, সহজ চাষপদ্ধতি ও অর্থনৈতিক গুরুত্বের কারণে ও পুষ্টি ঘাটতি মেটাতে শ্রীলংকা, নেপাল, চায়না, রাশিয়ান ফেডারেশন, জাপান, ফিলিপাইন, মালয়েশিয়া ও আফ্রিকান দেশগুলোতে রুই মাছের চাষ হচ্ছে। ইন্ডিয়ান আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের মিঠাপানির নদীতেও অনুপ্রবেশিত রুইয়ের সফল চাষ হচ্ছে।

শ্রেণিতাত্ত্বিক অবস্থান

Phylum : Chordata (জীবনের কোন না কোন দশায় নটোকর্ড, পৃষ্ঠীয় স্নায়ুরজ্জু ও গলবিলীয় ফুলকা রন্ধ্র থাকে)
Sub-Phylum : Vertebrata (নটোকর্ড মেরুদণ্ড দিয়ে প্রতিস্থাপিত)
Class : Actinopterygii (রশ্মিযুক্ত পাখনা)
Order : Cypriniformes (পার্শ্বরেখা সংবেদী অঙ্গ লেজের শীর্ষ পর্যন্ত বিস্তৃত)
Family : Cyprinidae (ভোমার দাঁতবিহীন, গলবিলীয় দাঁত উপস্থিত)।
Genus : *Labeo*
Species : *Labeo rohita*

স্বভাব (Habit) : জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে রুইয়ের পছন্দের আহার হচ্ছে প্ল্যাংকটন জাতীয় (প্রাণিপ্ল্যাংকটন ও উদ্ভিদপ্ল্যাংকটন) জীব। **আঙ্গুলিপোনা** দশায় (fingerling stage) প্রধানত প্রাণিপ্ল্যাংকটন গ্রহণ করলেও ডেসমিড (desmids), ফাইটোফ্ল্যাজেলেট (phytoflagellate), শৈবাল রেণু (algal spore) প্রভৃতিও গ্রহণ করে। তরুণ ও পূর্ণবয়স্ক মাছ পানির মাঝ স্তরের শৈবাল ও নিমজ্জিত উদ্ভিদ বেশি গ্রহণ করে (অর্থাৎ প্রধানত শাকাশী)। পৌষ্টিকনালিতে পচনশীল জৈব পদার্থ ও বালু, কাদা প্রভৃতি দেখে তলদেশি খাদকও মনে হয়। খুঁটে খাওয়ার উপযোগী নরম ঝালরযুক্ত ঠোঁট এবং মুখ-গলবিলীয় অঞ্চলে দাঁতের বদলে ধারাল **কর্তন আল** (edge) দেখে বোঝা যায় রুই মাছ নরম জলজ উদ্ভিদ আহার করে। ফুলকায় সরু চুলের মতো **ফুলকা-রেকার** (gill-raker) দেখে প্রমাণ পাওয়া যায় এ মাছ অতিক্ষুদ্র প্ল্যাংকটনও ছেঁকে খায়। মাছের পোনাগুলো ঝাঁক বেঁধে চলে, বয়স্ক মাছ পৃথক জীবন অতিবাহিত করে। রুই মাছ ১৪° সেলসিয়াসের নিচে তাপমাত্রায় বাঁচতে পারে না।

Labeo rohita-র বাহ্যিক গঠন

রুই (*Labeo*) একটি অস্থিময় মাছ। এর দেহ অনেকটা মাকু আকৃতির অর্থাৎ মধ্যভাগ চওড়া ও দুই প্রান্ত ক্রমশ সরু। প্রস্থ অপেক্ষা উচ্চতা বেশি, প্রস্থচ্ছেদ ডিম্বাকার। চলনের সময় পানির ভিতর গতি বাধা প্রাপ্ত হয় না বলে এ ধরনের আকৃতিকে **স্ট্রিমলাইড** (streamlined) বলে। রুই মাছের দেহ তিন অংশে বিভক্ত, যথা–**মাথা, দেহকাণ্ড ও লেজ**।

১. মাথা (Head)

দেহের অগ্রপ্রান্ত থেকে কানকোর পশ্চাৎপ্রান্ত পর্যন্ত অংশটি মাথা। মাথা ৪-৫ ইঞ্চি লম্বা ও পৃষ্ঠভাগ উত্তল। **তুণ্ড** (snout) ভোঁতা, নিচু, কিন্তু চোয়ালের সামনে বাড়ানো এবং কোনো পার্শ্বীয় খণ্ডবিহীন। মুখ অর্ধচন্দ্রাকার, নিচের দিকে উপপ্রান্তীয়ভাবে অবস্থিত ও আড়াআড়ি বিস্তৃত এবং মোটা ঝালরের মতো উর্ধ্ব ও নিম্নোষ্ঠে আবৃত। উর্ধ্বচোয়ালের পিঠের

দিকে একজোড়া নরম ও ছোট **ম্যাক্সিলারি বার্বেল** (maxillary barbels) থাকে। তুণ্ডের পৃষ্ঠদেশে দুচোখের সামনে একজোড়া **নাসারন্ধ্র** (nostrils) অবস্থিত। প্রত্যেক নাসারন্ধ্রের পেছনে ও মাথার দুপাশে একটি করে বড় চোখ রয়েছে। চোখে পাতা থাকে না, কিন্তু কর্ণিয়া স্বচ্ছত্বকীয় আবরণে আবৃত। মাথা আঁইশবিহীন, দেহকাণ্ড মিউকাসময় **সাইক্লয়েড** (cycloid) আঁইশে আবৃত।

মাথার পেছন দিকে দুপাশে ফুলকা-প্রকোষ্ঠকে ঢেকে অবস্থান করে দুটি বেশ বড় ও পাতলা ক (operculum)। কানকোর নিচের কিনারায় একটি করে পাতলা **ব্রাঙ্কিওস্টেগাল পর্দা** (branchiostegal memb যুক্ত থাকে, এটি ফুলকা-প্রকোষ্ঠের বড় অর্ধচন্দ্রাকার ছিদ্রকে ঢেকে রাখে।

২. দেহকাণ্ড (Trunk)

কানকোর শেষভাগ থেকে পায়ু পর্যন্ত দেহের মধ্য অংশটি দেহকাণ্ড। এ অংশটি চওড়া এবং বিভিন্ন ধরনের (fin) বহন করে। পাখনাগুলো পূর্ণ বিকশিত এবং অস্থিময় **পাখনা-রশ্মি** (fin rays) যুক্ত। দেহ পশ্চাৎপ্রান্তের অঙ্কীয়দিকে ঠিক মাঝ বরাবর তিনটি ছোট ছিদ্র থাকে : প্রথমে পায়ুছিদ্র, মাঝে জননছিদ্র এবং স রেচনছিদ্র।

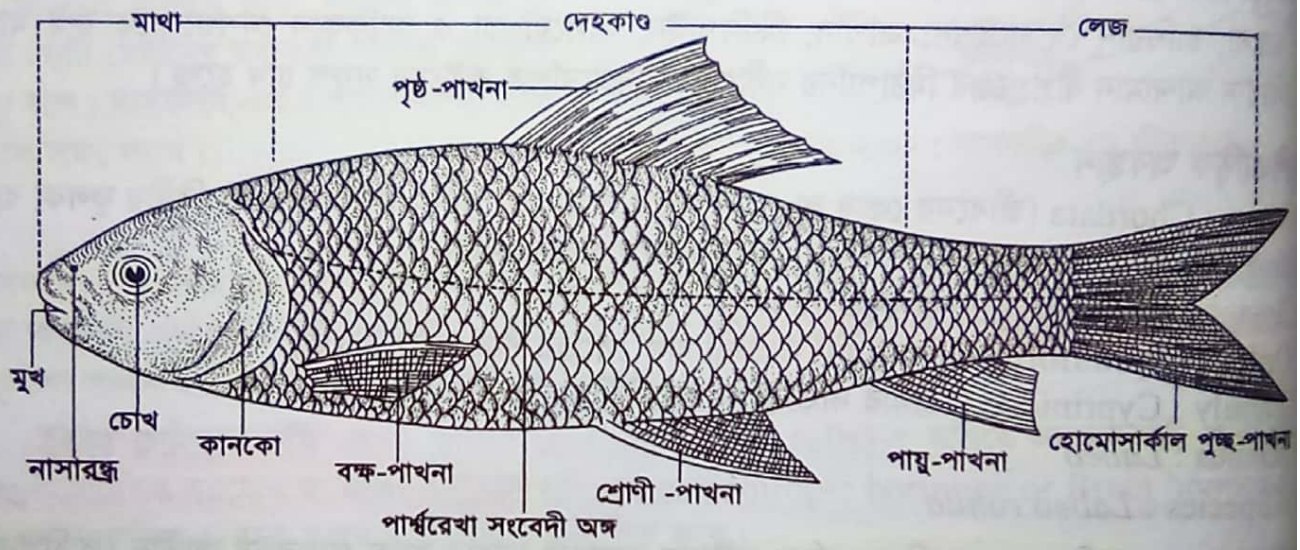

চিত্র ২.৩.১ : *Labeo rohita*-র বাহ্যিক গঠন (পার্শ্ব দৃশ্য)

পাখনাসমূহ (Fins) : মাছের চলনাঙ্গকে পাখনা বলে। পাখনা সাধারণত চাপা ও পাখনা-রশ্মিযুক্ত। পাখনার ভি অবস্থিত সমান্তরালভাবে সজ্জিত সূক্ষ্ম শলাকার অন্তঃকঙ্কালকে **পাখনা-রশ্মি** (fin rays) বলে। রুই মাছে মোট ধরনের পাখনা দেখা যায়–

- **পৃষ্ঠ-পাখনা** (Dorsal fin) : দেহকাণ্ডের মাঝ বরাবরের পেছনে বড়, কিছুটা রম্বস আকারের একটি মাত্র পাখনা অবস্থিত। এর উপরের দিকের মধ্যভাগ অবতল। এতে ১৪-১৬ টি পাখনা-রশ্মি থাকে।
- **বক্ষ-পাখনা** (Pectoral fin) : কানকোর ঠিক পেছনে দেহকাণ্ডের সম্মুখ পার্শ্বদিকে একজোড়া বক্ষ-প রয়েছে। প্রতিটি পাখনা ১৭-১৮টি পাখনা-রশ্মিযুক্ত।
- **শ্রোণী-পাখনা** (Pelvic fin) : একজোড়া শ্রোণী-পাখনা বক্ষ-পাখনার সামান্য পেছনে অবস্থিত এবং ৯টি পাখনা-রশ্মিযুক্ত।
- **পায়ু-পাখনা** (Anal fin) : পায়ুর ঠিক পেছনে দেহের অঙ্কীয়দেশের মধ্যরেখা বরাবর একটি পায়ু-প থাকে। এটি ৬-৭টি পাখনা-রশ্মিযুক্ত।
- **পুচ্ছ-পাখনা** (Caudal fin) : লেজের পশ্চাতে অবস্থিত পাখনাই পুচ্ছ-পাখনা। এতে আছে ১৯টি পাখনা র পুচ্ছ-পাখনা রুই মাছের চলাচলে এবং অন্যান্য পাখনা দেহের ভারসাম্য রক্ষায় কাজ করে।

দেহের দুপাশে একসারি ছোট গর্ত আছে যা আঁইশের নিচে অবস্থিত একটি লম্বা খাদের সঙ্গে যুক্ত। এ খাদ ও স সমন্বয়ে মাছের **পার্শ্ব রেখাতন্ত্র** (lateral line organ) গঠিত হয়। এতে অবস্থিত সংবেদী কোষ পানির তরঙ্গ থেকে গুণাগুণ সংক্রান্ত রাসায়নিক সংবেদ গ্রহণ করে।

৩. লেজ (Tail)

পায়ুর পরবর্তী অংশটি লেজ। এর শীর্ষে রয়েছে **হোমোসার্কাল** (homocercal) ধরনের পুচ্ছ-পাখনা। এটি উল্লম্বতলে (vertical plane) প্রসারিত এবং পেছনে, উপরে ও নিচে দুটি প্রতিসম বাহ্যিক খণ্ডে বিভক্ত। ডার্মাল রশ্মিগুলো উপরে ও নিচের খণ্ডে বড়, মাঝখানে ছোট।

আঁইশ (Scales)

রুই মাছের দেহকাণ্ড ও লেজ মিউকাসময় **সাইক্লয়েড** (cycloid) ধরনের (কারণ গোলাকৃতি) আঁইশে আবৃত। এগুলো পাতলা, প্রায় গোল ও রূপালি চকচকে। পৃষ্ঠদেশীয় আঁইশের কেন্দ্র লালচে, প্রান্ত কালো রংয়ের। কেন্দ্রের লালচে রং জনন ঋতুতে আরও গাঢ় ও উজ্জ্বল হয়। জলচর উদ্ভিদসমৃদ্ধ পরিবেশের রুই মাছে পৃষ্ঠদেশের রং লালচে-সবুজ হতে পারে। আঁইশে এককেন্দ্রিক বৃত্তাকার স্তরে স্তরে অস্থি-উপাদান জমা হওয়ায় আঁইশের উপরিভাগে বৃত্তাকার উঁচু আল ও নিচু খাদ সৃষ্টি হয়। স্তরগুলোর কেন্দ্রটি হচ্ছে **ফোকাস** (focus)। এটি সাধারণত একপাশে থাকে। উঁচু আলগুলোকে বলে সার্কুলাস (বহুবচনে–সার্কুলি) বা বৃদ্ধিরেখা। এগুলোর সাহায্যে বাৎসরিক বৃদ্ধির ও বিভিন্ন ঋতুতে বৃদ্ধি সম্বন্ধে প্রকৃত ধারণা পাওয়া যায়। সাধারণত বসন্তকালে ও গ্রীষ্মে আঁইশের বৃদ্ধি বেশি হয়। আঁইশের সম্মুখভাগ তন্তুময় যোজক টিস্যু-নির্মিত এবং ডার্মিসের পকেটে প্রবিষ্ট থাকে। পশ্চাৎভাগ ডেন্টিন-নির্মিত ও উন্মুক্ত। উন্মুক্ত অংশে থাকে স্পষ্ট বৃদ্ধিরেখা ও অনেক রঞ্জক কোষ। আঁইশগুলো পরস্পরকে আংশিক ঢেকে লম্বালম্বি ও কোণাকুণি সারিতে বিন্যস্ত থাকে। আঁইশগুলো সবসময় মিউকাসের পাতলা পিচ্ছিল আস্তরণে আবৃত থাকে।

চিত্র ২.৩.২ : রুই মাছের আঁইশ

Labeo rohita-র রক্ত সংবহনতন্ত্র

রক্তবাহিকাবিস্তৃত এবং হৃৎপিণ্ড দিয়ে নিয়ন্ত্রিত এ তন্ত্রের মাধ্যমে রক্ত দেহের বিভিন্ন অংশে সঞ্চালিত হয়। রুই মাছের রক্ত লাল। এটি **রক্তরস** (plasma) ও **রক্তকণিকা** (blood corpuscles) নিয়ে গঠিত। রক্তকণিকা দুধরনের–লোহিতকণিকা ও শ্বেতকণিকা। লোহিতকণিকা প্রায় ডিম্বাকার ও নিউক্লিয়াসযুক্ত। শ্বেতকণিকা দেখতে অ্যামিবার মতো (amoeboid)। হৃৎপিণ্ড, ধমনি, শিরা ও কৈশিকনালির সমন্বয়ে *Labeo*-র রক্ত সংবহনতন্ত্র গঠিত।

হৃৎপিণ্ড (Heart)

রুই মাছের ফুলকাদুটির পেছনে **পেরিকার্ডিয়াল গহ্বর** (pericardial cavity) নামে এক বিশেষ ধরনের গহ্বরে হৃৎপিণ্ড অবস্থান করে। **পেরিকার্ডিয়াম** (pericardium) নামক আবরণে হৃৎপিণ্ডটি আবৃত থাকে। অন্যান্য মাছের মতো রুই মাছের হৃৎপিণ্ডটিও দুই প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট–একটি **অলিন্দ** বা **অ্যাট্রিয়াম** (atrium) এবং অন্যটি **নিলয়** বা **ভেন্ট্রিকল** (ventricle)। এছাড়া **সাইনাস ভেনোসাস** (sinus venosus) নামে একটি উপপ্রকোষ্ঠ রয়েছে। নিচে হৃৎপিণ্ডের বিভিন্ন উপ-প্রকোষ্ঠ ও প্রকোষ্ঠসমূহের বর্ণনা দেয়া হলো।

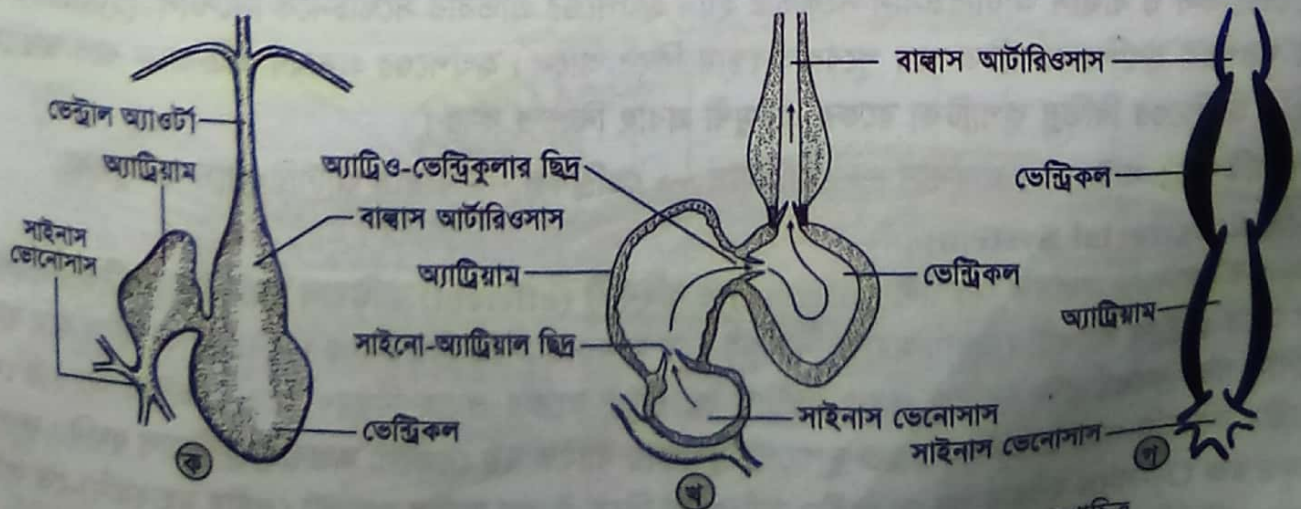

চিত্র ২.৩.৩ : *Labeo*-র হৃৎপিণ্ড; (ক) বহির্গঠন, (খ) লম্বচ্ছেদ, (গ) রেখাচিত্র

❐ **সাইনাস ভেনোসাস :** এটি পাতলা প্রাচীরবিশিষ্ট উপপ্রকোষ্ঠ যা হৃৎপিণ্ডের পৃষ্ঠদেশে অবস্থিত এবং **অ্যাট্রিয়াল** (sino-atrial) ছিদ্রপথে অ্যাট্রিয়ামের সাথে যুক্ত। এ পথে শিরা থেকে সংগৃহীত CO_2-সমৃদ্ধ রক্ত প্রবেশ করে।

❐ **অ্যাট্রিয়াম (অলিন্দ) :** এটি পেরিকার্ডিয়াল গহ্বরের সম্মুখ পৃষ্ঠভাগে অবস্থিত পাতলা প্রাচীরবিশিষ্ট বৃহত্তম এটি একদিকে সাইনাস ভেনোসাস অন্যদিকে **অ্যাট্রিও-ভেন্ট্রিকুলার** (atrio-ventricular) ছিদ্রপথে ভেন্ট্রিকলে

❐ **ভেন্ট্রিকল (নিলয়) :** এটি হৃৎপিণ্ডের সর্বশেষ প্রকোষ্ঠ। পেরিকার্ডিয়াল গহ্বরের অঙ্কীয়দেশে অ প্রকোষ্ঠটির প্রাচীর পুরু ও মাংসল এবং সম্মুখে **বাল্বাস আর্টারিওসাস** (bulbus arteriosus)-তে উন্মুক্ত।

বাল্বাস আর্টারিওসাস : রুই মাছের হৃৎপিণ্ডে **কোনাস আর্টারিওসাস** (conus arteriosus) নেই। তার বাল্বাস আর্টারিওসাস নামক একটি গঠন দেখা যায় যা মূলত ভেন্ট্রাল অ্যাওর্টার স্ফীত হওয়া গোড়া বা মূল। এটি থেকে ভেন্ট্রাল অ্যাওর্টায় রক্ত চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে। এটি হৃৎপিণ্ডের কোন অংশ নয়।

কপাটিকাসমূহ (Valves)

হৃৎপিণ্ডের উপপ্রকোষ্ঠ ও প্রকোষ্ঠগুলোর সংযোগ ছিদ্রে **কপাটিকা** (valve) থাকে। কপাটিকাগুলো শুধু দিকে খুলে, ফলে রক্তের পশ্চাৎগতি রুদ্ধ হওয়ায় রক্তের প্রবাহ থাকে একমুখি। বিপরীত প্রবাহে কপাটিকাগু দেয়। রুই মাছের হৃৎপিন্ডে নিচে বর্ণিত কপাটিকাগুলো পাওয়া যায়।

❐ **সাইনো-অ্যাট্রিয়াল কপাটিকা** (Sino-atrial valve) : সাইনাস ভেনোসাস ও অ্যাট্রিয়ামের মাঝে ছিদ্রপথে এ কপাটিকা থাকে।

❐ **অ্যাট্রিও-ভেন্ট্রিকুলার কপাটিকা** (Atrio-ventricular valve) : অ্যাট্রিয়াম ও ভেন্ট্রিকলের মাঝে অ্যাট্রিও-ভেন্ট্রিকুলার ছিদ্রপথে এ কপাটিকা অবস্থান করে।

❐ **ভেন্ট্রিকুলো-বাল্বাস কপাটিকা** (Ventriculo-bulbus valve) : এটি ভেন্ট্রিকল ও বাল্বাস অ্যাওর্টা অবস্থিত কপাটিকা।

হৃৎপিণ্ডের মাধ্যমে রক্ত সংবহন (Blood circulation)

সংকোচন ও প্রসারণের মাধ্যমে হৃৎপিণ্ড রক্ত পরিবহন করে। কপাটিকাসমূহের নিয়ন্ত্রণের ফলে হৃ প্রকোষ্ঠগুলোর মধ্যে রক্ত সংবহনের একমুখিতা দেখা যায় এবং এ ধরনের হৃৎপিণ্ডকে **এক চক্র হৃৎপিণ্ড** (single heart) বলে। হৃৎপিণ্ডের মধ্য দিয়ে কেবল CO_2-সমৃদ্ধ রক্ত বাহিত হয় বলে রুইমাছের হৃৎপিণ্ডকে **ভেনা** (venous heart) বা **শিরা হৃৎপিন্ড** বলা হয়ে থাকে।

হৃৎপিণ্ড থেকে CO_2-সমৃদ্ধ রক্ত একমুখী প্রবাহে O_2-সমৃদ্ধ হওয়ার জন্য ফুলকায় প্রেরিত হয়। একটি ছ তালে হৃৎপিণ্ডের বিভিন্ন অংশ নির্দিষ্ট সময় অন্তর সংকুচিত হয়। প্রথমে সাইনাস ভেনোসাসে সঙ্কোচন ঘটে। পরে অ্যাট্রিয়াম, ভেন্ট্রিকল ও বাল্বাস আর্টারিওসাস সংকুচিত হয়। হৃৎপিণ্ডের প্রতিবার সঙ্কোচনকে **সিস্টোল** (systole) সিস্টোলের পরপরই হৃৎপিণ্ড প্রসারিত হয়ে পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসে। হৃৎপিণ্ডের প্রসারণ প্রক্রিয়াকে বলে **ডায়া** (diastole)। হৃৎপিণ্ডের বিভিন্ন কপাটিকা রক্তের একমুখী প্রবাহ নিশ্চিত করে।

রক্তের গতিপথ : সাইনাস ভেনোসাস → অ্যাট্রিয়াম → ভেন্ট্রিকল → বাল্বাস আর্টারিওসাস → ফুলকা

ধমনিতন্ত্র (Arterial System)

Lobeo-র ধমনিতন্ত্র প্রধানত **অন্তর্বাহী** (afferent) ও **বহির্বাহী** (efferent) **ব্রাঙ্কিয়াল ধমনি** নিয়ে গঠিত। হৃৎ ভেন্ট্রিকল থেকে **ভেন্ট্রাল অ্যাওর্টা** (অঙ্কীয় মহাধমনি) সৃষ্টি হয়ে সামনের দিকে বিস্তৃত। এ ধমনির গোড়া স্ফীত হয়ে **আর্টারিওসাস** গঠন করে। এটি হৃৎপিন্ড থেকে ভেন্ট্রাল অ্যাওর্টায় রক্তের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে। ভেন্ট্রাল অ্যাওর্টা যেসব পার্শ্বীয় রক্তনালি পথে CO_2-সমৃদ্ধ রক্ত দুপাশের ফুলকায় বাহিত হয় সেগুলো **অন্তর্বাহী ব্রাঙ্কিয়াল ধমনি**। CO_2-সমৃদ্ধ রক্ত O_2-সমৃদ্ধ হওয়ার পর যে পার্শ্বীয় নালিগুলো দিয়ে ঐ রক্ত **ডর্সাল অ্যাওর্টা** (পৃষ্ঠীয় মহাধমনি)-তে হয় সেগুলো **বহির্বাহী ব্রাঙ্কিয়াল ধমনি**।

ক. অন্তর্বাহী ব্রাঙ্কিয়াল ধমনি (Afferent Branchial Artery) : বাল্বাস অ্যার্টারিওসাস থেকে সৃষ্ট ভেন্ট্রাল অ্যাওর্টা বা অঙ্কীয় মহাধমনির প্রতিপাশ থেকে ৪টি করে মোট ৪ জোড়া অন্তর্বাহী ব্রাঙ্কিয়াল ধমনি বের হয়। ১ম জোড়া ধমনি প্রথম ফুলকা-জোড়ায় প্রবেশ করে। অনুরূপভাবে, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ জোড়া ধমনি যথাক্রমে ২য়, ৩য় ও ৪র্থ ফুলকা-জোড়ায় CO_2-সমৃদ্ধ রক্ত বহন করে।

খ. বহির্বাহী ব্রাঙ্কিয়াল ধমনি (Efferent Branchial Artery) : চারজোড়া ফুলকা থেকে চারজোড়া বহির্বাহী ব্রাঙ্কিয়াল ধমনির সৃষ্টি হয়। প্রথম বহির্বাহী ধমনি অঙ্কীয়দেশে হাইঅয়েড আর্চের সিউডোব্রাঙ্কে রক্ত বহন করে এবং সিউডোব্রাঙ্কের সম্মুখে **অপথ্যালমিক ধমনি** (ophthalmic artery) হিসেবে বিস্তৃত হয়। প্রতি পাশের ১ম ও ২য় বহির্বাহী ব্রাঙ্কিয়াল ধমনি মিলে পৃষ্ঠালম্বি **পার্শ্বীয় ধমনি** বা **ল্যাটেরাল অ্যাওর্টা** (lateral aorta) গঠন করে। ৩য় ও ৪র্থ বহির্বাহী ব্রাঙ্কিয়াল ধমনি ল্যাটেরাল আওর্টায় উন্মুক্ত হওয়ার আগে একত্রে মিলিত হয়। ল্যাটেরাল অ্যাওর্টা সম্মুখে **ক্যারোটিড ধমনি**রূপে বিস্তৃত হয় এবং করোটিকার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। দুপাশের ল্যাটেরাল অ্যাওর্টা পশ্চাতে একীভূত হয়ে **ডর্সাল অ্যাওর্টা** (dorsal aorta) গঠন করে এবং পেছন দিকে বিস্তৃত হয়। দুই পাশের ল্যাটেরাল অ্যাওর্টা ও ক্যারোটিড ধমনি মিলে গলবিল অঞ্চলের পৃষ্ঠীয়দেশে একটি ডিম্বাকার ধমনি বলয় সৃষ্টি করে। এর নাম **সারকিউলাস সেফালিকাস** (circulus cephalicus)।

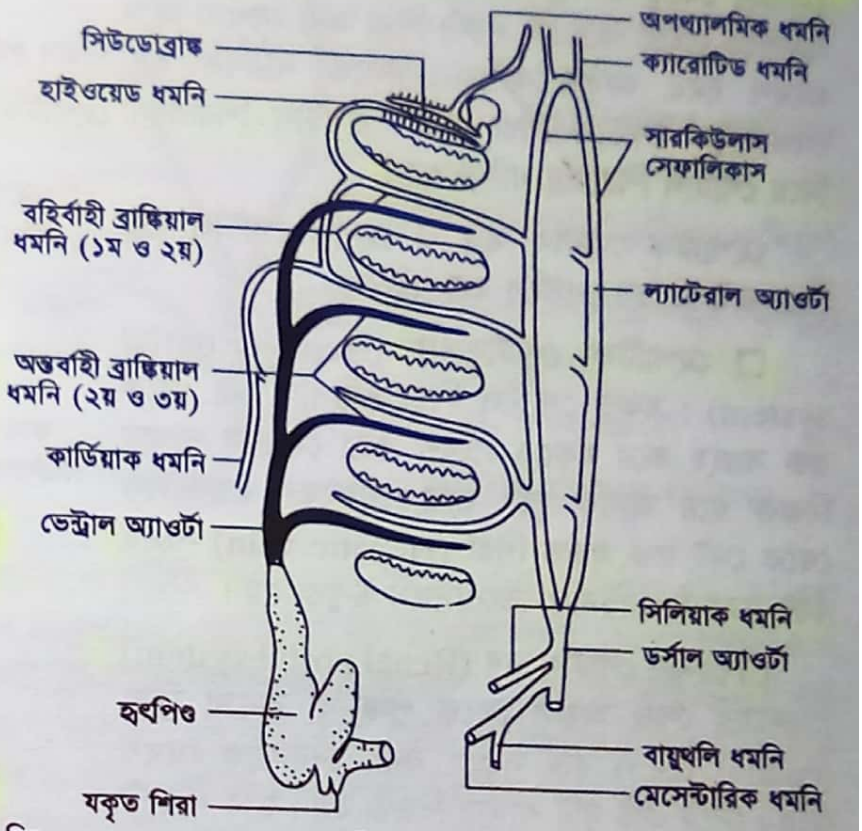

চিত্র ২.৩.৪ : *Labeo*-র অন্তর্বাহী(▬) ও বহির্বাহী (▭) ব্রাঙ্কিয়াল ধমনি

ডর্সাল অ্যাওর্টা মেরুদণ্ডের নিচে মধ্যরেখা বরাবর লেজ পর্যন্ত প্রসারিত। যাত্রাপথে এটি যে সব প্রধান শাখা সৃষ্টি করে তা হচ্ছে–

১. **সাবক্ল্যাভিয়ান ধমনি** (Subclavian artery) : বক্ষপাখনা ও বক্ষচক্রের দিকে বিস্তৃত হয়।

২. **সিলিয়াকো-মেসেন্টারিক ধমনি** (Coeliaco-mesenteric artery) : পাকস্থলি, অন্ত্র, যকৃত, অগ্ন্যাশয়, মলাশয় প্রভৃতি আন্ত্রিক অঙ্গে রক্ত পরিবহন করে।

৩. **প্যারাইটাল ধমনি** (Parietal artery) : দেহ প্রাচীরে রক্ত সরবরাহ করে।

৪. **রেনাল ধমনি** (Renal artery) : বৃক্কে রক্ত বহন করে।

৫. **ইলিয়াক ধমনি** (Iliac artery) : শ্রোণী-পাখনায় রক্ত পরিবহন করে।

৬. **কডাল ধমনি** (Caudal artery): লেজে রক্ত সরবরাহ করে।

শিরাতন্ত্র (Venous System)

কৈশিক জালিকা (blood capillaries) থেকে উৎপন্ন হয়ে, যেসব রক্তনালি দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে অক্সিজেনবিহীন (deoxygenated) রক্ত সংগ্রহ করে হৃৎপিন্ডের সাইনাস ভেনোসাসে নিয়ে আসে, সেগুলোই মিলিতভাবে **শিরাতন্ত্র** গঠন করে। রুইমাছের শিরাতন্ত্রকে প্রধান দুটি ভাগে ভাগ করা হয়। যথা-**১. সিস্টেমিক শিরাতন্ত্র** এবং **২. পোর্টাল শিরাতন্ত্র**। নিচে এদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো।

১. সিস্টেমিক শিরাতন্ত্র (Systemic Venus System) : যেসব শিরার মাধ্যমে দেহের বিভিন্ন অঙ্গ বা তন্ত্র থেকে রক্ত সরাসরি হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসে সেগুলোকে **সিস্টেমিক শিরা** বলে। সিস্টেমিক শিরার সমন্বয়ে গঠিত হয় সিস্টেমিক শিরাতন্ত্র। একজোড়া **সম্মুখ কার্ডিনাল শিরা**, একজোড়া **জুগুলার শিরা** ও একজোড়া **পশ্চাৎ কার্ডিনাল শিরা** রুই মাছের সিস্টেমিক শিরাতন্ত্রের প্রধান অংশ গঠন করে। শরীরের সম্মুখ অংশ থেকে সম্মুখ কার্ডিনাল শিরা ও জুগুলার শিরা রক্ত সংগ্রহ করে সেপাশের **ডাক্টাস কুভিয়ে** (ductus cuvieri)-তে উন্মুক্ত হয়। পশ্চাৎ কার্ডিনাল শিরা দেহের পশ্চাৎভাগ

থেকে রক্ত সংগ্রহ করে এবং সেপাশের ডাক্টাস কুভিয়েতে উন্মুক্ত হয়। উভয় পশ্চাৎ কার্ডিনাল শিরা **সেগমেন্টাল শিরা, রেনাল শিরা, জেনিটাল শিরা** ইত্যাদি থেকেও রক্ত গ্রহণ করে। উভয় ডাক্টাস ক্যুভিয়ে হৃৎপিণ্ডের সাইনাস ভেনোসাস হয়। প্রতিপাশের বক্ষ-পাখনা ও শ্রোণী-পাখনা থেকে **সাবক্ল্যাভিয়ান শিরা** রক্ত সংগ্রহ করে ডাক্টাস ক্যুভিয়ে-এর সাইনাস ভেনোসাসে প্রেরণ করে। এছাড়া ডান ও বাম পশ্চাৎ কার্ডিনাল শিরা কতিপয় অনুপ্রস্থ শিরা দ্বারা সংযুক্ত এদের **অনুপ্রস্থ অ্যানাস্টোমোসিস** (transverse anastomosis) বলে।

২. পোর্টাল শিরাতন্ত্র (Portal system) : কৈশিক নালিকা থেকে উৎপন্ন হয়ে অক্সিজেনবিহীন রক্ত নিয়ে হৃৎপিণ্ডে যাবার পথে যে সকল শিরা অন্য কোনো অঙ্গে প্রবেশ করে আবার কৈশিক নালিতে পরিণত হয়, সেগুলোকে **পোর্টাল শিরা** বলে। পোর্টাল শিরাগুলো নিয়ে **পোর্টাল শিরাতন্ত্র** গঠিত হয়।

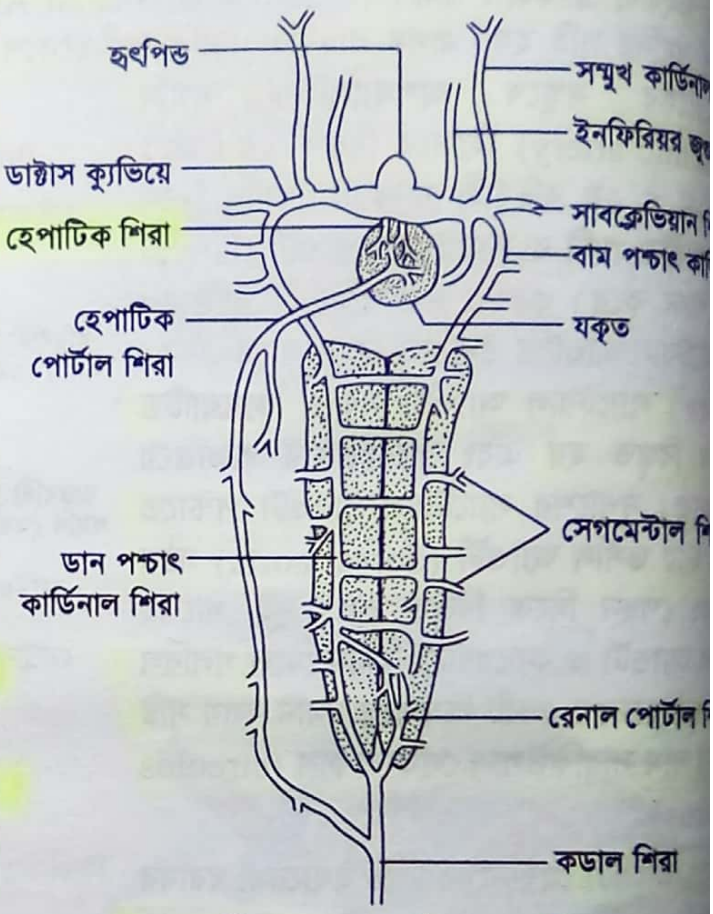

চিত্র ২.৩.৫ : রুই মাছের শিরাতন্ত্র

হেপাটিক পোর্টাল তন্ত্র ও রেনাল পোর্টাল তন্ত্র নিয়ে রুই মাছের পোর্টাল তন্ত্র গঠিত।

❒ **হেপাটিক পোর্টালতন্ত্র** (Hepatic portal system) : যকৃত পোর্টাল শিরা পরিপাক তন্ত্র থেকে রক্ত সংগ্রহ করে যকৃতে প্রবেশ করে সেখানে শাখায় বিভক্ত হয়ে জালক সৃষ্টি করে। যকৃতের রক্তজালক থেকে সেই রক্ত **যকৃত শিরা** (Hepatic vein) সংগ্রহ করে সরাসরি সাইনাস ভেনোসাসে উন্মুক্ত হয়।

❒ **রেনাল পোর্টাল তন্ত্র** (Renal portal system) : দেহের লেজ অঞ্চল থেকে **পুচ্ছ** বা **কডাল শিরা** (caudal vein) রক্ত সংগ্রহ করে দেহকাণ্ডে প্রবেশ করে। দেহে এটি দুটি শাখায় বিভক্ত হয়। ডান শাখাটি ডান পশ্চাৎ **কার্ডিনাল শিরা** হিসেবে সম্মুখে অগ্রসর হয়, বাম শাখাটি বৃক্কে প্রবেশ করে বিভক্ত হয়ে জালিকা সৃষ্টি করে। একে **রেনাল পোর্টাল শিরা** বলে। বৃক্ক থেকে পশ্চাৎ কার্ডিনাল শিরা দিয়ে সংগৃহীত হয়ে ডাক্টাস কুভিয়ের মাধ্যমে সাইনাস ভেনোসাসে পৌছায়।

ব্যবহারিক অংশ

১. রুই / কাতলা / মৃগেল মাছের অন্তর্বাহী বা অ্যাফারেন্ট ব্রাঙ্কিয়াল ধমনিতন্ত্র পর্যবেক্ষণ

ব্যবচ্ছেদ পদ্ধতি : একটি রুই মাছকে চিৎ করে ট্রেতে রেখে বক্ষ অস্থিচক্র সাবধানে কেটে সরিয়ে ফেলে অক্ষীয়দেশে দেহত্বক ও পেশি কেটে ফেলতে হবে। হৃৎপিন্ড বহনকারী পেরিকার্ডিয়াম অপসারণ করে হৃৎপিন্ডকে উন্মুক্ত করতে হবে। এরপর হৃৎপিন্ডের সম্মুখ প্রান্তে অবস্থিত **ভেন্ট্রাল অ্যাওর্টা** (ventral aorta; অঙ্কীয় মহাধমনি)-র উৎপত্তি ও গন্তব্য অনুসরণ করে পেশি কেটে পরিষ্কার করার পর দেখা যাবে উভয় পাশে চারটি করে অন্তর্বাহী ব্রাঙ্কিয়াল ধমনি বেয়ে সেই পাশের ফুলকায় প্রবেশ করেছে। পেশিপর্দা ও ফুলকা ঝিল্লি পরিষ্কার করলে এগুলো স্পষ্ট দেখা যাবে। এবার ঘোলাটে পানি পাল্টে পরিষ্কার পানির নিচে ধমনিগুলো যথাযথভাবে পর্যবেক্ষণের পর চিত্র দেখে ব্যবহারিক খাতায় চিহ্নিত চিত্র আঁকতে হবে।

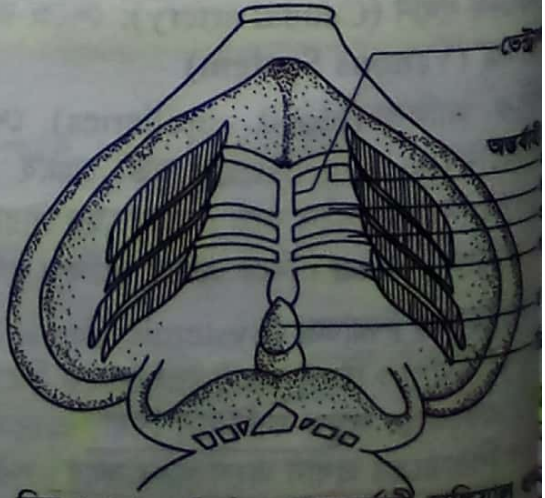
চিত্র ২.৩.৬ : *Labeo*-র অন্তর্বাহী ব্রাঙ্কিয়াল

২. রুই /কাতলা / মৃগেল মাছের বহির্বাহী বা ইফারেন্ট ধমনিতন্ত্র পর্যবেক্ষণ

ব্যবচ্ছেদ পদ্ধতি : অন্তর্বাহী ব্রাঙ্কিয়াল ধমনি শনাক্তের পর রুই মাছের মুখগহ্বরের এক পাশের ফুলকা ও কানকো কেটে ফেলতে হবে। হৃৎপিন্ডের পেছনে গলবিলের নিচের দিকে আড়াআড়িভাবে কেটে মুখগহ্বরকে উন্মুক্ত করতে হবে এবং সাবধানে মুখগহ্বরের ছাদের ঝিল্লি অপসারণ করলে **ডর্সাল অ্যাওর্টা** (dorsal aorta;পৃষ্ঠীয় মহাধমনি) দেখা যাবে। পেছনদিক থেকে ডর্সাল অ্যাওর্টা অনুসরণ করে সামনে অগ্রসর হলে বহির্বাহী ধমনিগুলো পাওয়া যাবে। এখন নোংরা পানি পাল্টে ধমনিগুলো পরিষ্কার পানির নিচে যথাযথভাবে পর্যবেক্ষণের পর চিত্র দেখে ব্যবহারিক খাতায় চিহ্নিত চিত্র আঁকতে হবে।

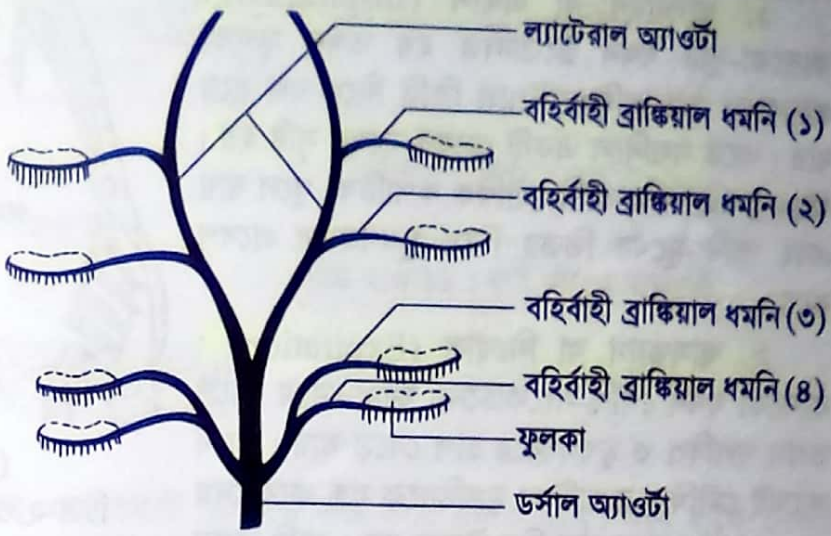

চিত্র ২.৩.৭ : *Labeo*-র বহির্বাহী ব্রাঙ্কিয়াল ধমনিতন্ত্র

Laboe rohita-র শ্বসনতন্ত্র

যে শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ায় কোষমধ্যস্থ খাদ্য জারিত হয়ে কার্বন ডাইঅক্সাইড নির্গত করে এবং শক্তির স্থিতিশক্তিকে গতিশক্তিরূপে মুক্ত করে, সে প্রক্রিয়া **শ্বসন** (respiration) নামে পরিচিত।

Labeo একটি অস্থিময় মাছ। **চারজোড়া ফুলকা** (gill) এ মাছের শ্বসন অঙ্গ। এগুলো মাথার দুপাশে দুটি **কানকো** (operculum)-তে আবদ্ধ **ফুলকা-প্রকোষ্ঠ** (branchial chamber)-এর ভিতর রক্ষিত এবং গলবিলের পার্শ্বপ্রাচীরে ও পেছনে অবস্থিত। কানকোর পশ্চাৎ কিনারা একটি পাতলা **ব্রাঙ্কিওস্টেগাল ঝিল্লি** (branchiostegal membrane) যুক্ত হয়ে মাথার অঙ্কীয়দেশে সেঁটে থাকে। ঝিল্লিটি কতকগুলো অস্থিনির্মিত দণ্ড বহন করে। এটি কানকোকে দেহপৃষ্ঠে আটকে রেখে ফুলকা প্রকোষ্ঠ বাইরে থেকে বন্ধ রাখে, এভাবে "শ্বাস পানি" আবদ্ধ রেখে মাছকে শ্বসনে সাহায্য করে।

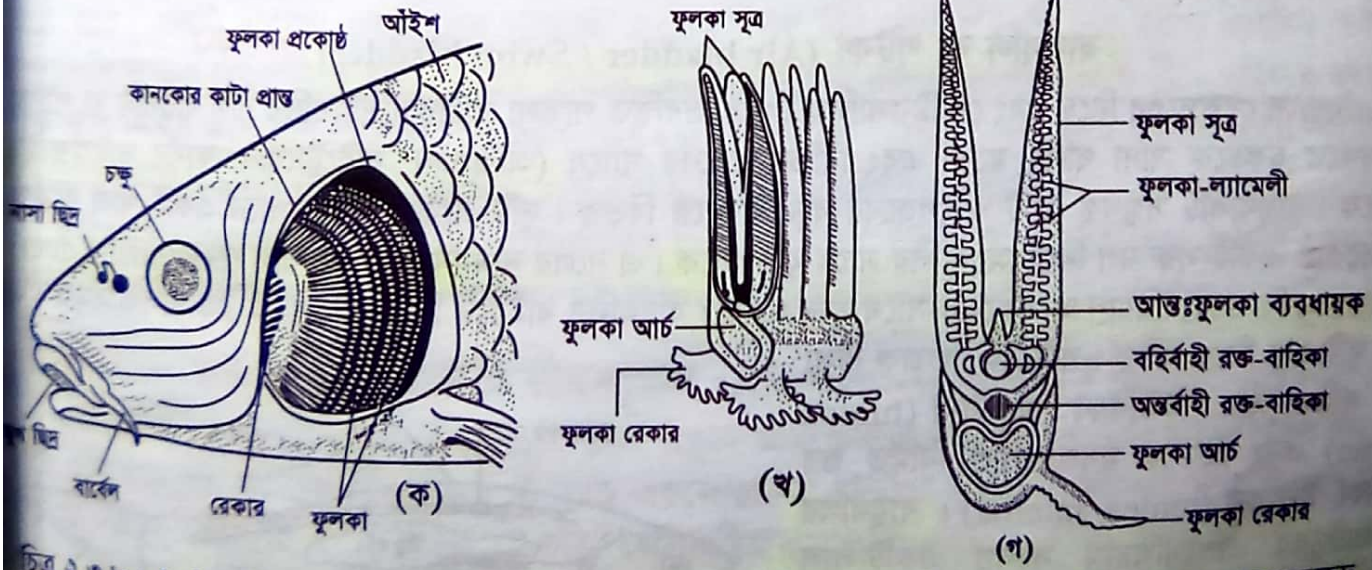

চিত্র ২.৩.৮ : *Labeo*-র : (ক) বামপাশের ফুলকা; (খ) ফুলকা-সূত্রের সাধারণ গঠন, (গ) একটি ফুলকা-সূত্রের লম্বচ্ছেদ।

ফুলকার গঠন (Structure of Gill)

প্রত্যেকটি ফুলকা দেখতে সুতার মতো এবং একেকটি **হোলোব্রাঙ্ক** (পূর্ণফুলকা), কারণ প্রত্যেক ফুলকা দুটি সদৃশ অর্ধাংশ নিয়ে গঠিত। প্রত্যেক অর্ধাংশকে বলে **হেমিব্রাঙ্ক** (অর্ধফুলকা)। প্রত্যেক হেমিব্রাঙ্ক একসারি করে **ফুলকা সূত্র** (gill filament) বা **ফুলকা ল্যামেলা** (gill lamella) বহন করে। এগুলো গোড়ায় যুক্ত, শীর্ষে মুক্ত। প্রতিটি সূত্র এপিথেলিয়ামে আবৃত অসংখ্য অনুপ্রস্থ প্লেট বহন করে। এপিথেলিয়াম রক্ত-জালিকা সমৃদ্ধ। প্রত্যেক ফুলকা একেকটি চওড়া **ফুলকা আর্চ** (gill arch)-এ অবলম্বিত। এভাবে প্রত্যেক আর্চে দুটি ফুলকা-সারি যুক্ত থাকে। আর্চের অন্তঃকিনারা বরাবর হয়ে কাঁটাযুক্ত পাতলা **ফুলকা রেকার** (gill racher) গঠন করে।

শ্বসন কৌশল (Mechanism of Respiration)

রুই মাছে দুই ধাপে শ্বাসক্রিয়া ঘটে– **শ্বাসগ্রহণ** ও **শ্বাসত্যাগ**। এক্ষেত্রে ফুলকা প্রকোষ্ঠ **চোষণ পাম্প** (suction pump) হিসেবে কাজ করে।

১. শ্বাসগ্রহণ বা প্রশ্বাস (Inspiration) : কানকো-দুটি যখন উত্তোলিত হয় তখন ফুলকা প্রকোষ্ঠের মুখ ব্রাঙ্কিওস্টেগাল ঝিল্লি দিয়ে বন্ধ হয়ে যায়। এতে গলবিলে একটি **চোষণ-বলের** সৃষ্টি হয়। ফলে মুখছিদ্র রক্ষাকারী মৌখিক কপাটিকা খুলে যায় এবং পানি মুখের ভিতর দিয়ে মুখগহ্বরে প্রবেশ করে।

২. শ্বাসত্যাগ বা নিঃশ্বাস (Expiration) : কানকো যখন পেশি-সংকোচনের ফলে নেমে আসে তখন গলবিল ও মুখগহ্বরে চাপ বেড়ে যায়। সাথে সাথেই মৌখিক কপাটিকা মুখছিদ্রকে বন্ধ করে দেয় এবং ফুলকা-প্রকোষ্ঠের ছিদ্র উন্মুক্ত হয়। পানি তখন এ ছিদ্রপথেই বেরিয়ে যায়। মুখ ও গলবিলের ভিতর দিয়ে অতিক্রমের সময় স্রোতপ্রবাহ নিচে অবস্থিত ফুলকাগুলোকে ভিজিয়ে দেয়।

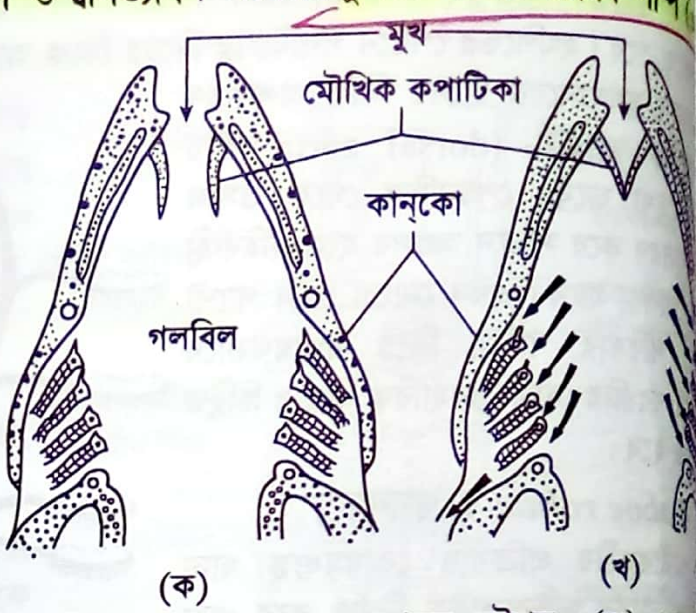

চিত্র ২.৩.৯ : *Labeo*-র শ্বসন কৌশল : (ক) প্রশ্বাস (খ) নিঃশ্বাস। তীরচিহ্ন পানির গতি নির্দেশক।

শ্বসনের শারীরতত্ত্ব (Physiology of respiration)

অন্তর্বাহী ফুলকা ধমনি CO_2-সমৃদ্ধ রক্ত বয়ে এনে ফুলকা সূত্রকের কৈশিক জালকে ছেড়ে দেয়। এরপর গ্রহণকালে নেয়া O_2-সমৃদ্ধ পানি ফুলকা সূত্রকের উপর দিয়ে বয়ে গেলে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় গ্যাসীয় বিনিময় ঘটে। পানিতে CO_2 ত্যাগ করে ও পানি থেকে O_2 গ্রহণ করে। O_2-সমৃদ্ধ রক্ত তখন বহিঃফুলকা ধমনির সাহায্যে পৃষ্ঠীয় এবং সারাদেহে ছড়িয়ে পড়ে।

বায়ুথলি বা পটকা (Air bladder / Swim bladder)

Labeo-র মেরুদণ্ডের নিচে এবং পৌষ্টিকনালির উপরে অবস্থিত পাতলা প্রাচীরবিশিষ্ট থলির নাম **বায়ুথলি** বা পটকা। এটি দেখতে চকচকে সাদা থলির মতো এবং বিভিন্ন ধরনের গ্যাসে (অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড) পূর্ণ থাকে। বায়ুথলিটি সম্মুখস্থ ছোট ও পেছনের বড় প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। দুটি প্রকোষ্ঠের মাঝখানে একটি খাঁজ রয়েছে। সম্মুখ প্রকোষ্ঠ একটি সরু নল দিয়ে অন্ননালির সাথে যুক্ত থাকে। এ নলের নাম **নিউম্যাটিক নালি** (pneumatic duct)। এটি অন্তঃকর্ণের ওয়েবেরিয়ান অসিকলের সাথে যুক্ত থাকে। বায়ুথলির বাইরের দিক ঘনসন্নিবিষ্ট রক্তজালক সমৃদ্ধ প্রাচীর দুটি স্তর নিয়ে গঠিত। বাইরের যোজক টিস্যু দিয়ে গঠিত স্তর **টিউনিকা এক্সটার্না** (tunica externa) এবং ভিতরে মসৃণ পেশি নির্মিত স্তর **টিউনিকা ইন্টারনা** (tunica interna)। বায়ুথলির অন্তঃপ্রাচীরের এপিথেলিয়াম সংলগ্ন একটি লাল বর্ণের **গ্যাস গ্রন্থি** থাকে। এ গ্রন্থিতে ঘনসন্নিবিষ্ট অসংখ্য কৈশিকনালি থাকে যাদের **রেটিয়া মিরাবিলিয়া** (retia mirabilia) বলে। সামনের প্রকোষ্ঠের এ গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত গ্যাসে বায়ুথলি পূর্ণ হয়। কিন্তু পেছনের প্রকোষ্ঠে অবস্থিত এ গ্রন্থি গ্যাস শোষণ করে।

চিত্র ২.৩.১০ : মাছের দেহে বায়ুথলির অবস্থান

বায়ুথলির কাজ

১. বায়ুথলি প্লবতারক্ষাকারী অঙ্গ হিসেবে কাজ করে।

২. বায়ুথলির প্রাচীরে অবস্থিত কৈশিকনালি থেকে বায়ুথলিতে অতিরিক্ত গ্যাস সরবরাহ করে অথবা বায়ুথলি

রক্তে গ্যাস শোষণ করে মাছ তার আপেক্ষিক গুরুত্ব নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

৩. বায়ুথলির মাছের আপেক্ষিক গুরুত্ব নিয়ন্ত্রণ করে পানির নিচে বিভিন্ন গভীরতায় মাছকে স্থির থাকতে সাহায্য করে।

৪. মাছ বায়ুথলি দ্বারা শব্দ গ্রহণ করতে পারে। বায়ুথলির সাথে **ওয়েবেরিয়ান অসিকল** (weberian ossicles) এর মাধ্যমে অন্তঃকর্ণের সংযোগ থাকে। শব্দ তরঙ্গ বায়ুথলি থেকে ওয়েবেরিয়ান অসিকলের মাধ্যমে অন্তঃকর্ণে প্রবেশ করে।

৫. অনেক মাছের বায়ুথলি শব্দ উৎপাদনেও সক্ষম।

৬. অক্সিজেনের আধার হিসেবেও বায়ুথলি ব্যবহৃত হয়।

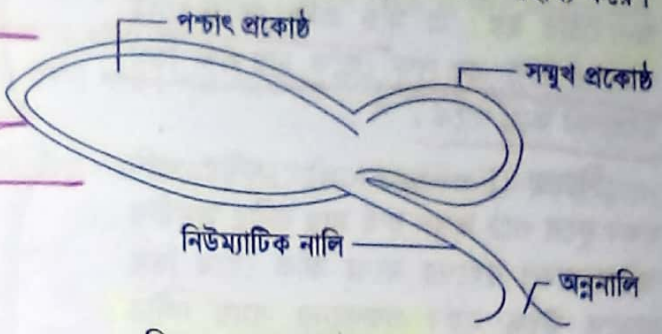

চিত্র ২.৩.১১ : রুই মাছের বায়ুথলি

ব্যবহারিক অংশ

১. রুই মাছের ফুলকা পর্যবেক্ষণ

ব্যবচ্ছেদ পদ্ধতি : প্রথমে একটি রুই মাছ নিয়ে এর মাথাটি বাঁ হতে শক্ত করে ধরতে হবে। ডান হাতে নেওয়া মোটা কাঁচি দিয়ে কানকো সাবধানে কেটে ফেললে ভিতরে চিরুনীর মতো ফুলকা দেখা যাবে। মাথার দুপাশে অবস্থিত চারজোড়া ফুলকা বিশেষ প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ। প্রকোষ্ঠের নাম ফুলকা প্রকোষ্ঠ। প্রত্যেকটি ফুলকা দেখতে সুতার মতো এবং দুটি সদৃশ অর্ধাংশ নিয়ে গঠিত। এগুলো ফুলকা সূত্র বহন করে।

প্রত্যেক ফুলকা একেকটি অস্থিময় ব্রাঙ্কিয়াল আর্চ-এ অবলম্বিত। আর্চের অন্তকিনারা প্রসারিত হয়ে কাঁটাযুক্ত পাতলা ফুলকা রেকার গঠন করে। চিত্র ২.৩.৮(ক)

২. রুই মাছের বায়ুথলি বা পটকা পর্যবেক্ষণ

ব্যবচ্ছেদ পদ্ধতি : একটি রুই মাছকে চিৎ করে ট্রের উপর রেখে লেজ এবং কানকোর দিকে পিন দিয়ে আটকে দিতে হবে। একটি ধারালো স্কালপেলের সাহায্যে পেটের দিকে ছিদ্র করে লম্বালম্বি পায়ু থেকে গলবিল পর্যন্ত চিরে মাংসপেশি ও ত্বক কেটে নিতে হবে। অন্ত্রের উপরের মিউকাস পর্দাটি ফরসেপস দিয়ে ধীরে ধীরে পরিষ্কার করে অন্ত্রের প্যাঁচ খুলে বিভিন্ন অংশ পিন দিয়ে আটকে দিতে হবে। পৌষ্টিকতন্ত্রের অঙ্গগুলো লক্ষ করে দেহাভ্যন্তরের অন্যান্য অংশ অপসারণ করলে বায়ুথলি দেখা যাবে (চিত্র : ২.৩.১১)।

পর্যবেক্ষণ : মেরুদণ্ডের নিচে এবং পৌষ্টিকনালির উপরে অবস্থিত বায়ুথলিটি বায়ুপূর্ণ এবং দেখতে চকচকে সাদা থলির মতো। বায়ুথলিটি দুটি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। দুই প্রকোষ্ঠের মাঝখানে একটি গভীর খাঁজ রয়েছে।

রুই মাছের প্রজনন ও জীবনবৃত্তান্ত (Reproduction and Life-history)

প্রজনন তন্ত্র (Reproductive system) : জনন ঋতুতে **জনন অঙ্গ** বা **গোনাড** (gonad) পূর্ণ বিকশিত হয়। পুরুষ মাছে একজোড়া লম্বা **শুক্রাশয়** (testis) ও স্ত্রী মাছে একজোড়া লম্বা **ডিম্বাশয়** (ovary) পটকার নিচে উদরীয় গহ্বরের পশ্চাতে শায়িত। শুক্রাশয় পেরিটোনিয়ামের ভাঁজ **মেসোরকিয়াম** (mesorchium) পর্দা দিয়ে দেহপ্রাচীরে ঝুলানো থাকে। ডিম্বাশয় পেরিটোনিয়ামের ভাঁজ **মেসোভেরিয়াম** (mesovarium) দিয়ে দেহপ্রাচীরে ঝুলানো থাকে। প্রত্যেক শুক্রাশয় থেকে একটি করে শুক্রনালি সৃষ্টি হয়। দুটি শুক্রাশয়ের দুটি শুক্রনালি পেছন দিকে এক হয়ে রেচনজনন রন্ধ্র পথে বাইরে মুক্ত। স্ত্রী মাছে ডিম্বাশয় জোড়া, আকারে বড় এবং ডিম্বনালিহীন। পরিপক্ক ডিম্বাশয় থেকে জনন ঋতুতে ডিম দেহবিবরে মুক্ত হয়। এখান থেকে ঐ ডিম রেচন জনন সাইনাসের অগ্রপ্রাচীর থেকে অস্থায়ীভাবে গঠিত এবং একজোড়া **জনন রন্ধ্র** (genital aperture) পথে দেহের বাইরে বেরিয়ে যায়। রুই মাছের ডিম প্রচুর **কুসুম** (yolk) সমৃদ্ধ। সেন্ট্রোলেসিথাল

প্রজনন (Reproduction) : রুই মাছ দুবছর বয়সে জননক্ষম হয়ে ওঠে। স্রোতযুক্ত নদীর পানিতে জনন ঘটে, বদ্ধ পানিতে নয়। বাংলাদেশে আগে ৩ বছর বয়সে জননক্ষম হতো। কিন্তু অন্তঃপ্রজননের (inbreeding) কারণে এখন রুই মাছে এক বছর বয়সেই জনন ঘটে। জুন-জুলাই মাসের দিকে এরা প্রজননের জন্য তৈরি হয়।

সাধারণত স্ত্রী মাছ ৫১–৭০ সেমি এবং পুরুষ মাছ ৬৫ সেমি. লম্বা হলে প্রজননের জন্য তৈরি হয়। এ মাছ প্রতি কেজি দেহ ওজনের জন্য এক লক্ষ থেকে চার লক্ষ ডিম উৎপাদন করে থাকে।

নিষেক (Fertilization) : নদীর পানি যখন ফুলে ওঠে তখন রুই মাছ নদীর অগভীর অংশে প্রবল বর্ষণের মধ্যে ঝাঁক বেঁধে ডিম ছাড়তে উদ্বুদ্ধ হয়। প্রজননের সময় নদীর পানির তাপমাত্রা থাকে ২৭-৩০° সেলসিয়াসের মধ্যে। এসময় পানিতে পর্যাপ্ত অক্সিজেন থাকে এবং পানি ঘোলা থাকে। স্ত্রী মাছ প্রথমে পানিতে **ডিম** (egg) ছাড়লে পুরুষ মাছ তার উপর **বীর্য** (sperm) ছড়িয়ে দেয়। রুই মাছের নিষেক দেহের বাইরে নদীর পানিতে সম্পন্ন হয় বলে একে **বহিঃনিষেক** (external fertilization) বলে।

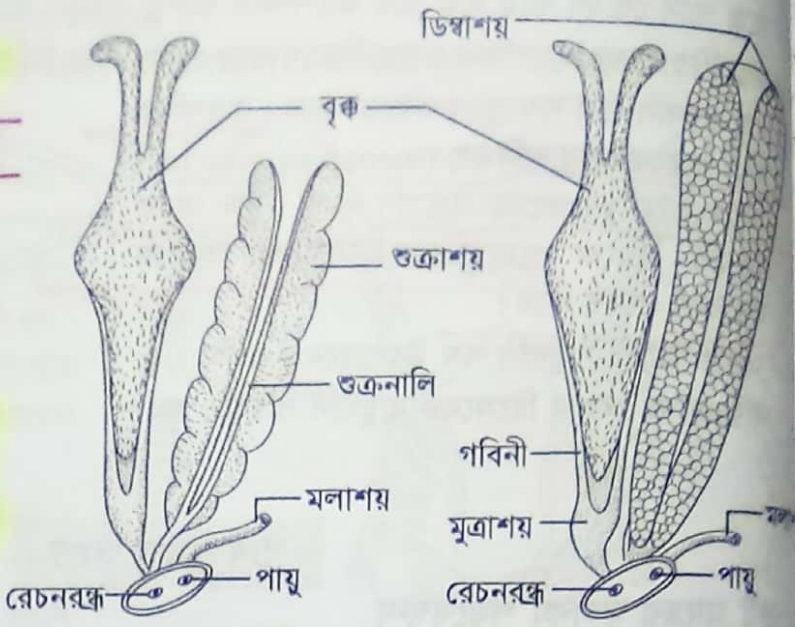

চিত্র ২.৩.১২ : *Labeo*-র রেচন-জনন তন্ত্র (বায়ে-পুরুষ ও ডানে-

রুই মাছের জীবন চক্র (Life cycle)

ডিম নিষিক্ত হওয়ার ৩০-৪৫ মিনিট পর বিভাজন বা **ক্লিভেজ** (cleavage) শুরু হয়। ক্লি **মেরোব্লাস্টিক** (meroblastic) ধরনের; অর্থাৎ বেশি কুসুমযুক্ত ডিমের আংশিক ক্লিভেজ যা শুধুমাত্র **প্রাণিমেরু** (an pole)-তে ঘটে এবং কুসুমথলির পাশে কোষের চাকতি সৃষ্টি হয়। নিষিক্ত ডিম্বাণু বা জাইগোট মাইটোসিস বিভা মাধ্যমে ছোট ছোট কোষ বা **ব্লাস্টোমেয়ার** (blastomere) গঠন করে। পরে এগুলো **ব্লাস্টোডার্ম** (blastoder **পেরিব্লাস্ট** (periblast) নামে দুটি কোষস্তরে বিন্যস্ত হয়। এরপর ব্লাস্টোডার্ম থেকে **ভ্রূণ** (embryo) ও পেরিব্লাস্ট **কুসুম** (yolk) সৃষ্টি হয়। ক্লিভেজ শেষ পর্যন্ত **ব্লাস্টুলা** (blastula) সৃষ্টি করে। ব্লাস্টুলা মূলত একটি পাতের মতো কে যা কুসুমের উপর অবস্থান করে। যে প্রক্রিয়ায় ব্ল গঠিত হয় তাকে **ব্লাস্টুলেশন** (blastulation) ব্লাস্টুলা ধীরে ধীরে দ্বিস্তরী **গ্যাস্ট্রুলা** (gastru পরিবর্তিত হয়। গ্যাস্ট্রুলার উপরের স্তর এপি (epiblast) এবং ভিতরের স্তর **হাইপো** (hypoblast) নামে পরিচিত। গ্যাস্ট্রুলার পেছ থেকে লেজ ও সামনের দিক থেকে বিভিন্ন অ সূচনা হয়। যে প্রক্রিয়ায় গ্যাস্ট্রুলা থেকে বিভি তৈরি হয় তার নাম **অর্গানোজেনে** (organogenesis)। ভ্রূণের মধ্যে নানা প পরিবর্ধন দেখা দেয় এবং ১৫–১৮ ঘন্টার মধ্যে ডি ভেতর থেকে **লার্ভা** (larva) বেরিয়ে আসে। লার্ভাকে ডিমপোনা বা **রেণুপোনা** বলে। এমন অ পোনা কোন খাদ্য গ্রহণ করে না এবং কুসুম থেকে নেয়। লার্ভা দশার পরিবর্তনগুলো নিম্নরূপ।

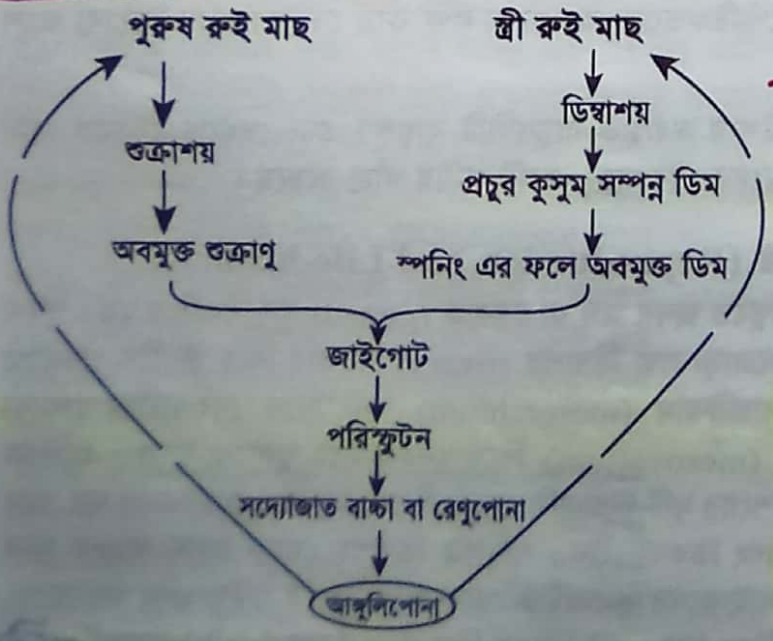

চিত্র ২.৩.১৩ : জীবন চক্রের রেখাচিত্র

- ৬ ঘন্টা পর লার্ভা মাঝে মধ্যে উপরে-নিচে নড়া-চড়া করে। কুসুমের দুই প্রান্ত তখন সরু হয় এবং দেহপিন্ডের কুসুম থলির সামনে অবস্থান নেয়। তখন কুসুম থলি বেশ বড় থাকে। এ অবস্থায় লার্ভা পানির তলদেশে সময় কাটায়। কুসুম থলি থেকে পুষ্টি গ্রহণ করে।

- ১২ ঘন্টা পর লার্ভার চোখের রঙ কালো হতে থাকে। ক্রোমাটোফোর উৎপন্ন হওয়ায় এমন হয়। এসময় কুসুম থলি সরু ও লম্বা হয়।
- ২৪ ঘন্টা পর কুসুম থলির পিঠে কালো দাগ দেখা দিতে শুরু করে। লার্ভায় ফুলকা আর্চ দৃশ্যমান হয়। চোখ মাথার উপরে অবস্থান নেয় এবং নটোকর্ড পেছন দিকে (লেজের দিকে) উর্ধ্বমুখী হয়। তখন লেজ ও পায়ু-পাখনা স্পষ্ট দেখা যায়। এ সময় লার্ভা স্বচ্ছ থাকে, তবে ফ্যাকাশে হলদে রঙেরও হতে পারে।
- ৩৬ ঘন্টা পর লার্ভায় বক্ষ-পাখনা ও নিচের ঠোঁট স্পষ্ট দেখা যায়। পৃষ্ঠ-পাখনায় কিছু কালো দাগ এবং পুচ্ছ-পাখনায় পুচ্ছ দণ্ড দেখা দেয়।
- ৪৮ ঘন্টা পর লার্ভা কিছুটা লম্বা হয়ে ৬.০–৬.৪ মি.মি. হয়। এ সময় কুসুম থলি সামনে দিকে সামান্য উত্তল

চিত্র ২.৩.১৪ : রুই মাছের জীবন চক্রের ধাপসমূহ

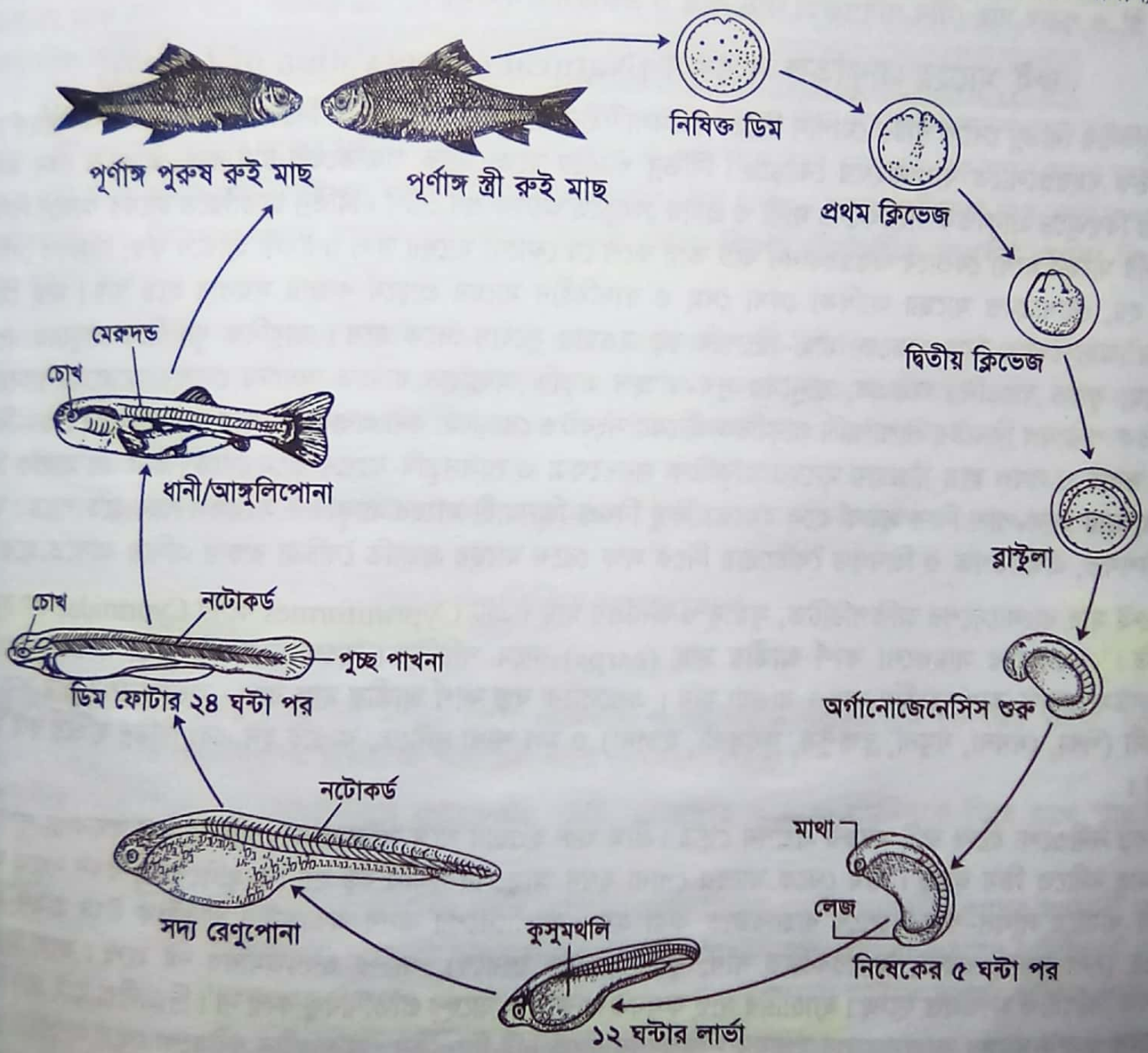

হয় এবং বায়ু থলি দেখা দেয়। লার্ভার মাথায় ক্রোমাটোফোর উৎপন্ন হতে থাকে, তাই মাথা কালো রঙ ধারণ করে। তখন ফুলকা আর্চ স্পষ্ট এবং দেহ ফ্যাকাশে হলদে রঙে পরিবর্তিত হয়।

- ৭২ ঘন্টা পর লার্ভার বায়ু থলি ডিম্বাকার ধারণ করে এবং বক্ষীয়-পাখনা স্পষ্ট হতে শুরু করে। পিঠের দুপাশ উজ্জ্বল হলুদ রঙ ধারণ করে, কুসুম থলি বিলীন হয়ে যায় এবং **লার্ভা দশার সমাপ্তি ঘটে**। তাপমাত্রার কারণে এ সময়ের কম-বেশি হতে পারে।
- ৯৬ ঘন্টা পর লার্ভার মুখ স্পষ্ট হয়ে খাদ্য গ্রহণ শুরু করে। কুসুম থলি প্রায় মিলিয়ে যায় এবং এটি **ধানীপোনা বা আঙ্গুলিপোনা** হিসেবে পরিচিত হয়।

- ৫ দিন বয়সের পোনা ৮–৮.৫ মি.মি. লম্বা হয়। এ সময় লেজের কাছে লাল দাগ দেখা যায়, যা দেখে রুই মাছের পোনা বলে শনাক্ত করা যায়। কানকোর রেখা সুস্পষ্ট গঠিত হয়, নটোকর্ডের শেষ প্রান্ত কিছুটা বেঁকে এবং পাখনাগুলোতে রশ্মি আরও স্পষ্ট হয়।
- ১০ দিন বয়সে পোনার দৈর্ঘ্য হয় ১৫–১৮ মি.মি.। সবগুলো পাখনায় পূর্ণাঙ্গ সংখ্যক পাখনা-রশ্মি বিদ্যমান হয়। নাসারন্ধ্র দেখা যায় এবং অন্তঃস্থ বিভাজন স্পষ্ট হয়।
- ১৫ দিন বয়সের পোনার দৈর্ঘ্য হয় ২৩ মি.মি.। তখন মুখের দুপাশে একটি করে **বার্বেল** (barbel) দেখা যায় পায়ুর অবস্থান ও খাদ্যনালি স্পষ্ট হয়। এ অবস্থায় আঁইশ দৃশ্যমান না হলেও পোনার দৈহিক গড়ন মোটামুটি সম্পূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ স্ত্রী ও পুরুষ মাছ যৌন পরিপক্কতা লাভ করে ও প্রজননে সক্ষম হয়।
- এর পর মাছটির কেবল আঙ্গিক পরিবর্তন ও আকারের পরিবর্ধন ঘটে। স্ত্রীমাছ আকারে পুরুষ অপেক্ষা বড়

রুই মাছের প্রাকৃতিক সংরক্ষণ (Natural conservation of *Labeo*)

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পুষ্টির যোগান দিতে, ঝামেলাবিহীন মাছ পেতে ও স্বাদের দিকে নজর রাখতে রুই মাছে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ব্যাপকহারে বেড়েছে। বিভিন্ন খামারে যতো উন্নত পদ্ধতিতেই চাষ করা হোক না কেন ছাপিয়ে বিশ্বজুড়ে প্রাকৃতিক সংরক্ষণের দাবী ও প্রচার বেড়েছে অনেক গুণ বেশি। বিভিন্ন হ্যাচারিতে চাষের কারণে ও নির্দিষ্ট মাছের মধ্যে যেভাবে অন্তঃপ্রজনন ঘটে তার ফলে যে কোনো মাছের ভাল গুণাবলী হারিয়ে যায়, জিনগত বিনষ্ট হয়, রোগাক্রান্ত মাছের আধিক্য দেখা দেয় ও স্বাদবিহীন মাছের প্রাচুর্যে বাজার সয়লাব হয়ে যায়। মাছের 'মাছের' স্বাদ পেতে হলে মাছকে 'মাছ' হিসেবে বড় হওয়ার সুযোগ দিতে হবে। আধুনিক পৃথিবীতে মানুষের বেড়েছে, ভূখন্ড বাড়েনি। অতএব, মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ প্রভৃতি অব্যাহত রাখতে অন্যান্য দেশের মতো বাংলা প্রাকৃতিক পরিবেশ বিনষ্টের পাশাপাশি প্রাকৃতিক জীবের সংকটও বেড়েছে, নদী প্রবাহ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এবং হাওর বাওর ভরাট ও দখল হয়ে যাওয়ায় মাছের প্রাকৃতিক জননক্ষেত্র ও লালনভূমি বহুগুণ কমে গেছে। তবে এর মধ্যে নদী বা তার আশ-পাশ নিয়ে সতর্ক হলে হয়তো কিছু বিশুদ্ধ জিনধারী মাছের প্রাকৃতিক সংরক্ষণ সম্ভব হতে পারে পরিবেশগত, প্রজাতিগত ও জিনগত বৈচিত্র্যের দিকে লক্ষ রেখে মাছের প্রজাতি বৈচিত্র্য রক্ষায় এগিয়ে আসতে হবে।

রুই মাছ বাংলাদেশের অতিপরিচিত, সুস্বাদু ও জনপ্রিয় মাছ। এটি Cypriniformes বর্গের Cyprinidae গোত্রের প্রজাতি। এ গোত্রের মাছগুলো **কার্প জাতীয় মাছ** (carps) নামে পরিচিত। বাংলাদেশে রুই ছাড়া কাতলা, মৃগেল, কালিবাউস প্রভৃতি কার্প জাতীয় মাছও পাওয়া যায়। এগুলোকে **বড় কার্প জাতীয় মাছ** বলে। বাংলাদেশের প্রায় সব বড় নদী (পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, কর্ণফুলী, হালদা) ও মূল শাখা নদীতে, কাপ্তাই হ্রদ এবং বিভিন্ন হাওরে বিস্তৃত।

বড় নদীগুলো হচ্ছে রুই মাছের প্রজনন ক্ষেত্র। গ্রীষ্ম শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কালবৈশাখি ও ভরা অমাবস্যা-পূর্ণিমায় রুই মাছ নদীতে ডিম ছাড়ে। ডিম থেকে মাছের পোনা যখন আঙ্গুলের সমান বড় হয় (আঙ্গুলিপোনা) তখন সংগ্রহ মাছের খামারে লালন-পালন শেষে বাজারজাত করা হয়। বাংলাদেশের এসব অভ্যন্তরীণ প্রাকৃতিক উৎস ক্রমশ আসছে (নদী দখল, ভরাট, অপরিকল্পিত বাঁধ, দূষণ ইত্যাদি কারণে), পানির গুণগতমানও নষ্ট হচ্ছে। ফলে জিনগত বৈশিষ্ট্যও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। **হ্যাচারির মাছ কখনও প্রাকৃতিক মাছের প্রতিনিধিত্ব করে না।** বিজ্ঞানীরা তাই প্রা পরিবেশ ও রুই মাছের আবাসস্থলের যথাযথ সংরক্ষণের দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন। অভ্যন্তরীন নদীগুলো থেকে প্রাকৃতি মাছ পাওয়া দুরূহ হয়ে পড়েছে। এ কারণে, অন্ততঃ বিশুদ্ধ রুই মাছের সংরক্ষণে সবার নজর এখন বাংলাদেশের নদীর দিকে।

হালদা নদী বাংলাদেশের কেবল একমাত্র দেশি নদী নয়, এটি একমাত্র জোয়ার-ভাটার নদী যেখান থেকে মাছ পোনার বদলে রুই মাছের নিষিক্ত ডিম সংগ্রহ করে নিয়ে যান। এসব ডিম থেকে ফোটানো পোনার বৃদ্ধি যতো বেশি হয় অন্য কোনো জায়গা থেকে সংগৃহীত পোনায় তা হয় না, হ্যাচারীতেতো হয়ই না। এ জন্য এক কেজি রেণুর দাম প্রায় ৬০ হাজার টাকা, যা দেশের অন্য জায়গার পোনার দামের চেয়ে কয়েকগুণ বেশি। হালদা নদীকে তাই প্রা জিনব্যাংক সমৃদ্ধ **'মৎস্য খনি'** নামে অভিহিত করা হয়। এ নদীসহ অন্যান্য স্থানে রুই মাছের প্রাকৃতিক সংরক্ষণে কাজ হচ্ছে সরকারের পক্ষ থেকে বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী রুই মাছের প্রাকৃতিক বিচরণ স্থলগুলোকে **অভয়াশ্রম** ঘোষণা করা। লক্ষ ও উদ্দেশ্য এবং জলাশয় ভেদে মৎস্য অভয়াশ্রম নিচে বর্ণিত বিভিন্ন ধরনের হতে

১. **মৌসুমি অভয়াশ্রম :** নির্দিষ্ট প্রজাতির মাছ বছরের নির্দিষ্ট সময়ে উপযুক্ত বা নির্দিষ্ট প্রজনন ক্ষেত্রে বংশবৃদ্ধি ঘটিয়ে র্দিষ্ট আবাসে বিচরণ করে থাকে। তাই অবাধ প্রজনন ও বিচরণের জন্য সুনির্দিষ্ট জলাশয় বছরের নির্দিষ্ট সময়ে মাছের ভয়াশ্রম হিসেবে সরকার থেকে ঘোষণা করা হয়। যেমন- হালদা নদীর মদুনা ঘাট এলাকা, কাপ্তাই লেকের লং জাদু ও লাইছড়ি এলাকা। এখানে হালদা নদীর সামান্য একটি অংশকে (মদুনা ঘাট এলাকা) অভয়াশ্রম ঘোষণা করা হয়েছে। ও মৌসুমি অভয়াশ্রম। কিন্তু এ নদীতে সারা বছরই কম-বেশি রুই মাছের আনাগোনা দেখতে পাওয়া যায়। যেহেতু র্দিষ্ট সময় ছাড়া অন্য সময় এ নদী অরক্ষিত থাকে তাই মানুষ গোপনে সারা বছরই মা-রুই মাছ আহরণে ব্যস্ত থাকে। তএব বিষয়টি পর্যালোচনা করে যথাশীঘ্র সম্ভব সম্পূর্ণ হালদা নদীকে **সাংবাৎসরিক অভয়াশ্রম** ঘোষণা করে কঠোর রদারির মধ্যে রাখতে হবে। দেশের অন্যান্য নদীতে মৌসুমি অভয়াশ্রম কার্যকর হলেও হালদা নদীকে রুই মাছের জন্য ংবাৎসরিক অভয়াশ্রম ঘোষণা করতে হবে।

২. **বিশেষ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এলাকা :** হালদা নদী রুই মাছের বিশুদ্ধ জিন সংরক্ষণে অবদান রেখে চলেছে। হাড়া, এটি একমাত্র জোয়ার ভাটার নদী যা দেশেরই এক প্রান্তে উৎপত্তি লাভ করে দেশেরই এক স্থানে সমাপ্ত হয়েছে। য়ার-ভাটা সমৃদ্ধ অঞ্চল এমনিতেই খুব সমৃদ্ধ কিন্তু অত্যন্ত সংবেদনশীল অঞ্চল। সংবেদনশীলতা ধরে রাখতে পারলে ইয়ের প্রজনন ও বিচরণ অব্যাহত থাকবে। এ কারণে হালদা নদীকে **বিশেষ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এলাকা** হিসেবে ঘাষণা করতে হবে।

অন্ততঃ হালদা নদীতে রুই মাছের প্রাকৃতিক সংরক্ষণ করতে হলে নদীপাড়ে প্রতিষ্ঠিত দূষণ সৃষ্টিকারী শিল্প-প্রতিষ্ঠান পন বন্ধ করতে হবে, মা-মাছ শিকারে কঠোর আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে, অপরিকল্পিত বাঁধ, ড্যাম ও স্লুইস ইট নির্মাণ বন্ধ করতে হবে এবং রুই মাছের ডিম ছাড়ার যে নির্দিষ্ট বাঁক রয়েছে তার বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন রাখতে হবে। এ য়ে পর্যবেক্ষণে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি অবশ্যই থাকতে হবে। যে সব নদীতে প্রাকৃতিক রুই মাছ পাওয়া যায় সে সব দীর পাশে অবস্থিত বিশ্ববিদ্যালয়ের মৎস্যবিজ্ঞানীদের তত্ত্বাবধানে রুই মাছের প্রাকৃতিক সংরক্ষণ যথাযথ হবে বলে আশা রা যায়।

প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ

হাইড্রা – *Hydra vulgaris*

প্লোব্লাস্টিক প্রাণী : ভ্রূণ অবস্থায় যে সব প্রাণীর দেহে এক্টোডার্ম ও এন্ডোডার্ম নামের দুটি কোষস্তর থাকে, তারাই ডিপ্লোব্লাস্টিক বা দ্বিস্তরী বা দ্বিভ্রূণস্তরী প্রাণী। যেমন- হাইড্রা।

ইপোস্টোম : *Hydra*-র দেহের সম্মুখ প্রান্তের উঁচু, ছোট, মোচাকার অংশ যা মুখছিদ্রকে ঘিরে রাখে তার নাম হাইপোস্টোম।

ডোসাইট : *Hydra* সহ Cnidaria পর্বের সকল প্রাণীতে এপিডার্মিসের পেশি–আবরণী কোষের মধ্যবর্তী স্থানে গোলা, ডিম্বাকার বা নাসপাতি আকারের কোষকে নিডোসাইট বলে। বিশেষ ধরনের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এসব কোষ শিকার ধরা, চলাচল, আত্মরক্ষা, দেহকে কোনো বস্তুর সঙ্গে আটকে রাখতে সাহায্য করে।

মাটোসিস্ট : *Hydra*-র নিডোসাইটের স্ফীত মধ্যাংশের তরল পদার্থ পূর্ণ ও প্যাঁচানো সূত্রক সম্বলিত ক্ষুদ্র থলিকে নেমাটোসিস্ট বলে।

প্নোটক্সিন : নেমাটোসিস্টের ভিতরের আমিষ ও ফেনলে গঠিত বিষাক্ত তরল পদার্থকে হিপ্নোটক্সিন বলে।

সোগ্লিয়া : *Hydra*-র দেহপ্রাচীরের এপিডার্মিস ও গ্যাস্ট্রোডার্মিসের মধ্যবর্তীস্থানে অবস্থিত স্বচ্ছ, স্থিতিস্থাপক, কোষবিহীন, জেলির মতো আঠালো পদার্থকে মেসোগ্লিয়া বলে। এটি এপিডার্মিস ও গ্যাস্ট্রোডার্মিসের ভিত্তিতল এবং পেশি প্রবর্ধনগুলোর সংযুক্ততল হিসেবে কাজ করে এক ধরনের স্থিতিস্থাপক কঙ্কালের সৃষ্টি করে।

ট্রোভাস্কুলার গহ্বর : *Hydra*-র দেহের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত ফাঁকা গহ্বরকে সিলেন্টেরন বলে। সিলেন্টেরনে খাদ্যবস্তুর বহিঃকোষীয় পরিপাক ঘটে। এর মাধ্যমে খাদ্যসার, শ্বসন ও রেচন পদার্থ পরিবাহিত হয়। সে কারণে সিলেন্টেরনকে গ্যাস্ট্রোভাস্কুলার গহ্বর (পরিপাক-সংবহন গহ্বর) বলা হয়।